অঞ্জলি

বৈশাখী সংখ্যা ১৪২৬

প্রয়াস

এপ্রিল ২০১৯

শোক বার্তা

সিদ্ধার্থ ঘোষ (Sid) পূজারীরর সদস্য অনন্ত সম্ভাবনাময় একটি জীবন অকস্মাৎ শনিবার ৬ই এপ্রিল ২০১৯ এর সকালে কঠিন হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে সকলকে ছেড়ে চলে গেল অমর্তধামে। তাঁর বিয়োগে আমরা পূজারী পরিবার মর্মাহত। মৃত্যু জীবনের ধ্রুবসত্য এক ঘটনা। কিন্তু তা যখন বজ্রপাতের মত হটাৎ আবির্ভুত হয় তখন তাকে মেনে নেওয়া দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। আজ পূজারী পরিবার দিশাহারা, দিশাহারা সিদ্ধার্থের পরিবার। তার স্ত্রী অতসী ও ছোট্ট দুবছরের কন্যা ইরা, তাদের কে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা নেই। তাদের কে শুধু বলতে পারি,আমরা তোমাদের পাশে আছি। সিদ্ধার্থের বৃদ্ধ পিতা মাতা যারা সন্তান হারা হলেন তাদের শোকের সান্ত্বনা দেবে শুধুই সময় ।

সিদ্ধার্থের আত্মা চির শান্তি লাভ করুক -ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

RIP

Tribute to Mahatma Gandhi- Bapu, the Father of the Nation on 150th birth anniversary

"Generations to come will scarce believe that such as one as this ever in flesh and blood walked upon earth." -Albert Einstein

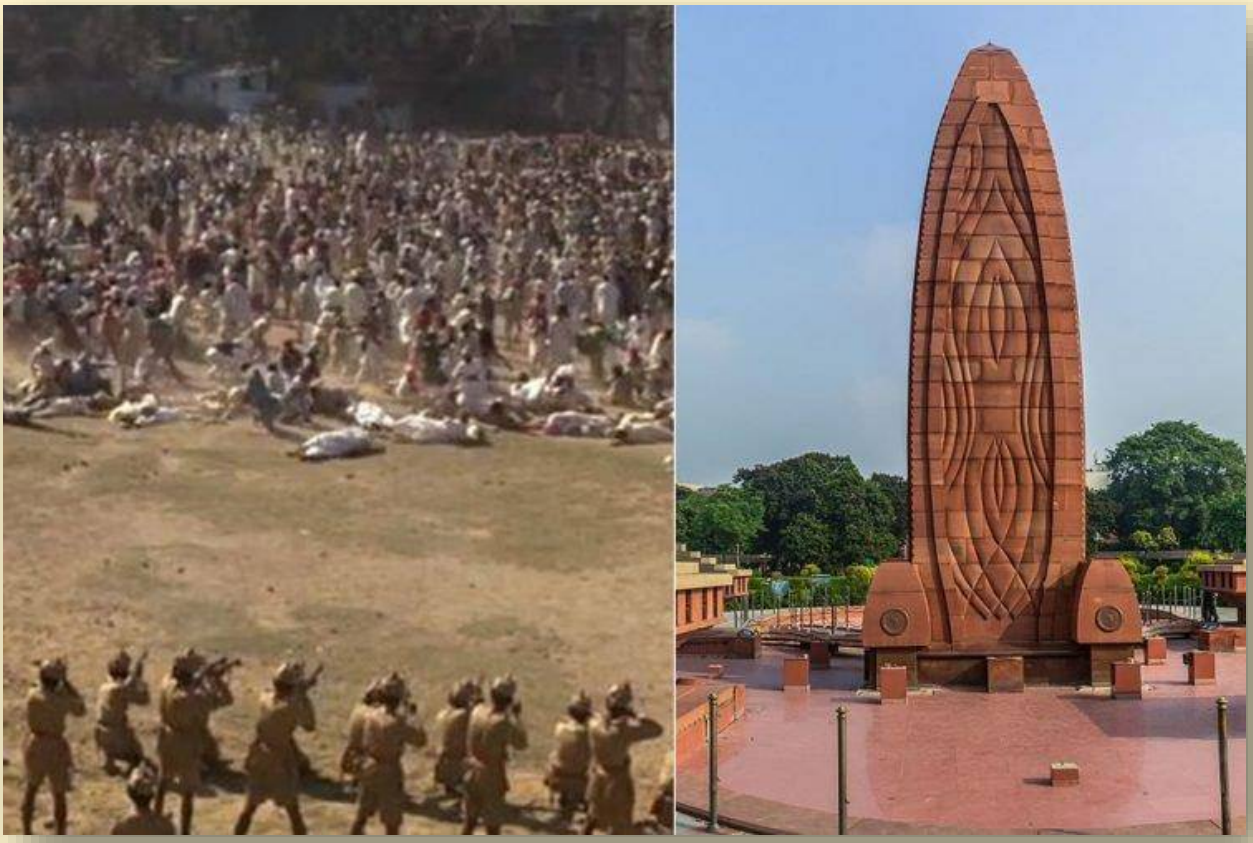

100 years of Jalianwalabag Massacre in Amritsar, Punjab (13th April 1919).

Rabindranath Tagore gave up the Knighthood bestowed by the British as a protest against this massacre.

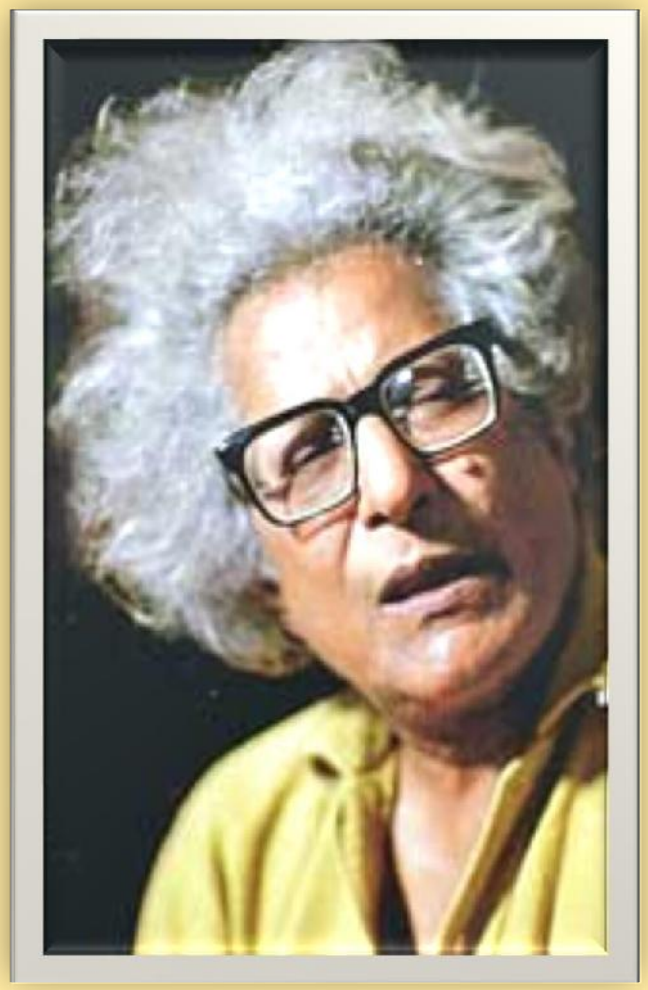

ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত

শতবর্ষে পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কে প্রণাম!

He was awarded the Shahitya Academy Award and Jyanpith Award for his excellent literary works. Government of India awarded him the highest civilian honor Padma Bhushan in 2003.

Tribute to some of eminent personalities departed in 2018/2019

Rama pada Choudhury-
Famous novelist

Atin Bandopadhyay-
Famous novelist

Dibyendu Palit-
Famous novelist

Pinaki Thakur-
Famous novelist

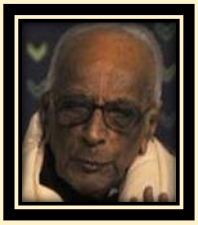

Niren Chakrabarty-
Famous poet

Mrinal Sen-
World famous film director

Supriya Devi-
Famous actress

Sridevi-
Famous actress

Gautam Dey-
Famous actor

Dwijen Mukhopadhyay-
Famous singer

Pratik Choudhury-
Famous singer

Kader Khan-
Actor

Chinmoy Roy
-Actor

Pujari pays respect to all our loved ones who passed away recently. RIP

Anjali Baisakhi 2019

Pujari Publication Team

Kalpana Banerjee

Kasturi Bose

Saikat Das

সকলকে জানাই নববর্ষের

শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

ভালো থাকবেন সকলে।

Cover page Design: Samik Das

Some images in the magazine are free downloads from internet

Pujari Board of Directors 2019

Nachiketa Nandy
Chairperson

Kallol Nandi
Director

Prosenjit Dutta
Director

Baisakhi Mukherjee
Director

Aradhana Bhattacharya
Director

Raja Roy
Director

Mohana Mitra Das
Director

Welcome message from the Chairman of Pujari BOD, 2019

Dear Friends,

It is my great honor to cordially welcome you to Pujari and invite you to attend our Baishakhi event on April 27th, 2019 at Berkmar High School.

Over the years, Pujari, as the epitome of Indian culture holds multiple activities and events to stimulate learning among the younger generation about the culture and history of India. At our Baishakhi event we are dedicated in developing a similar cultural event of very high standard that would commensurate with our collective nostalgia and aspirations.

Our current Execution Committee are working very hard to make this happen. We are focusing on every minute details in every area of activities including stage performances, food service, hospitality and so forth. We are continuously reviewing our plans and working on the betterment so that you can experience a very high standard of cultural programs and the matching support services with similar very high standards.

I'm extremely thankful to all of you for supporting our effort and I can assure you that on Boards' perspective, we will do everything we can do to keep your expectations fulfilled.

With Best Regards,

Nachiketa Nandy

Chairman

Pujari BOD 2019

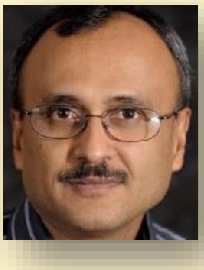

Pujari Executive Committee 2019

Banhi Nandi
President

Pabitra Bhattacharya
Vice President

Abhijeet Hazra
Vice President/
Sports

Sudipto (Neel)
Banerjee-Cultural

Ashit Chatterjee
Finance

Sanjib Banerjee
Cultural-External
Artists/ Sports

Samanwita Paul
General Secretary

Sudipta Samanta
Revenue Generation

Tamajit Sarkar
Facility

Sharmila Roy
Finance

Kalpana Banerjee
Publication

Kasturi Bose
Publication

Surajit Chatterjee
Facility

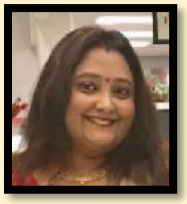

Payel Dutta
Decoration

Pranesh Choudhury
Puja

Bulbul Banik
Puja

Samik Saha
Food

Sushmit Mukherjee
Food

Saikat Das
Public Relations/ Web/
Communications

Welcome message from the President of Pujari, 2019

মহানন্দার শীতল হাওয়া, যমুনার ঘোলা জল, দিল্লীর সুখের নীড়, মা'র বকাবকি, এবং বাবার সোহাগের ডাক - সব ছেড়ে ছুড়ে এদেশে আসি বুক ভরা ভালো থাকার স্বপ্ন নিয়ে, পিছনে ফিরে না তাকানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে। ভয় নিয়ে ভাবিনি কখনো। বরাবর বাবার কাছ থেকে এটাই শুনে এসেছি যে, 'ভয় কে জয় করো।' সত্যি তো কাকে কাকে ভয় পাবো! কিসে কিসে ভয় পাবো! কোথায় কোথায় ভয় পাবো! ভয় নয়, বরাবর 'জয়' নিয়েই ভাবার চেষ্টা করি। তাই ছোট্ট পূজারীর দায়িত্ব নেবার ডাক পেয়ে - ভয় হয় নি একটুও। কিভাবে জয় করবো তাই ভাবতে ভাবতে শুরু করি পূজারীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাত্রাপালা। যাত্রা বললাম এই কারণে যে বিশ বছর পূজারীর সাথে এই পথ চলায় কোন সময়ে ছিল পাখোয়াজ, ঢোলকের চড়া আওয়াজ, ছিল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অট্টহাস্য, ছিল চা-কফির সুগন্ধ, আর ছিল ভক্তির প্রকাশ। 'যাত্রা' অর্থ তো পথচলাও হতে পারে। আজ এই বিশ বছর বাদে পিছনে ফিরে তাকালে অনেকটা পথও দেখতে পাই। দেখতে পাই পূজারীর বদল বহিরঙ্গে, কিন্তু আন্তরিকতায় অন্দরমহল আজও নিখাদ। শরীরের বৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু পৈতৃক 'জিন'গুলো তো শরীরের সমস্ত কোষে বহন করে চলেছে। তাই আসল সত্ত্বা বদলায় নি একটুও। এখনও পূজারীতে ভালোবাসা আছে, সঙ্গীতচর্চা আছে, পূজো-পার্বণ আছে, খাওয়া-দাওয়া, সমালোচনা, ভালোলাগালাগি - তাও হয়ে চলেছে। এইভাবেই চলুক পূজারী। আমরা সবাই যেন হাত ধরাধরি করে, গায়ে গা ঠেকিয়ে পূজারীকে রক্ষা করতে পারি বর্গিদের অত্যাচার থেকে, শিবাজীর বাঘনখ থেকে। আমরা শক্তি পূজো করবো, তবে শক্তির প্রকাশ করব না। এই কামনা এবং অনুরোধ রইল সবার কাছে।

আসুন, আমরা ভীত হয়ে না, 'মিত' হয়ে সমস্ত বৈরিতা দূর করে অপ্রতিকূল পরিবেশের ধার এবং ভার বহন করে পূজারীকে নিয়ে চলি অনেক আলোকবর্ষ দূরে।

বহ্নি নন্দী
সভাপতি, পূজারী

সম্পাদকীয়

এস হে বৈশাখ - বৈশাখকে আমন্ত্রনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বাঙালির বর্ষবরণ। নতুন বর্ষকে বরণ করার কত না তার উপাচার। সেখানে দেশ বিদেশ থাকেনা। বাঙালি যেখানে তার উৎসবও সেখানে। উৎসবের রূপ হয়তো পরিবর্তিত চেহারায় আসে। বিদেশের মাটিতে নবীন বর্ষকে বরণ করার প্রভাত ফেরী হয় না। "জাগরে পুরবাসী নবীন বরষের সূর্যখানি রে দেখো জাগি" । এই মন্ত্র হয়তো বলা হয় না। কিন্তু বর্ষ বরণ হয় ।

বৈশাখ হে মৌনী তাপস- দেশের বর্ষ বরণ শুরু বৃষ্টি বিহীন তীব্র দহনে প্রকৃতি তখন স্তব্ধ। তপস্যা মগ্ন মহাকাল যেন। মাঝে মাঝে কে যেন আসে উদ্ধত ঝড়ের বেশে,মলিনতা বিবর্ণতা কে উড়িয়ে দিয়ে সবুজের সূচনা করে দিয়ে যায়। শুভ্র সুগন্ধি পুষ্পের সুরভি ভেসে আসে বাতাসে তখন। এখানে অর্থাৎ বিদেশে প্রকৃতির কৃপনতায় কখনো বসন্তের আবহ, কখনো বৃষ্টির ছটা
কখনো বা একটু শীতের হালকা ছোঁয়া। কিন্তু আনন্দ থেমে থাকে না। আবহ যাই থাকুক না কেন আনন্দের উপকরণ তৈরি করে বর্ষ বরণ হয়।

সন্ধ্যা বেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মন ভরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত সেনের গানের সাথে আধুনিক গানের অনুষ্ঠান হয় দক্ষতার সাথে । আবৃত্তি, নাটক, নৃত্যর অনুষ্ঠান কিছুই বাদ থাকে না। রীতিমত গবেষণা মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজের সংস্কৃতির ধারাকে সুন্দর করে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে সগৌরবে সসম্মানে তুলে ধরে বাঙালী মনন। পোশাক পরিচ্ছেদও বাঙালিয়ানা প্রকাশ পায়। খাদ্য রসিক বাঙালীর রসনা নিবৃত্তির আয়োজনও বিপুল। বাঙালীর মস্তিষ্ক চর্চার প্রধান উপকরণ চা। চা ও কফির যোগান থাকে অপ্রতুল। নববর্ষের আরেক আকর্ষণ নিজেকে প্রকাশ করা। লেখনী ও আঁকার মধ্যে দিয়ে তার সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ পায় এই সময়। নতুন এই বৈশাখী সংখ্যা অঞ্জলি তারই বহিপ্রকাশ।

পূজারীর পাব্লিকেশন টিম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পত্রিকাটি প্রকাশ করে। যাদের লেখা ও আঁকা ছাড়া এই পত্রিকা সমৃদ্ধ হতো না তাদেরকে জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। পাঠক পাঠিকাদের কাছে আবেদন রইল পত্রিকাটি কেমন লেগেছে জানাবেন। সমালোচনা করবেন। যাতে ভুল সংশোধন করে ভবিষ্যতে আরো সুন্দর পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে পূজারীর অঞ্জলি পাব্লিকেশন টিম। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই কস্তূরী বসু কে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে এই পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছে।

বর্তমান যুগ technology-র যুগ। যা আমার কাছে আলিবাবার খাজনার ভান্ডার। যেখানে প্রবেশ করতে "চিচিং ফাঁক" মন্ত্র জানতে হয়। এই "চিচিং ফাঁক" মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সৈকত দাস, সমরেশ মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী মুখোপাধায়, নীল মজুমদার আমার জন্য খাজনার সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে। তাতেই হয়তো সম্ভব হলো এই পত্রিকা প্রকাশ। অনেক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা রইলো ওদের জন্য।

জীর্ণ পুরাতন যাক দূরে যাক। মানবিকতার উত্তরণ ঘটুক। বিশ্বকবির ভাষায়, "নব আনন্দে জাগো নব রবি কিরণে" ।

সম্পাদিকা কল্পনা ব্যানার্জী
পূজারী পাবলিকেশন

Puja Committee 2019

Pranesh Chaudhury

Sumona Banik

Bulbul Banik

Soma Choudhury

Sutapa Das

Soumya Bhattacharya

Tumpa Bhattacharya

Decoration team 2019

Payel Dutta

Aradhana Bhattacharya

Mohana Mitra Das

Debopriya Dey

Laxmipriya Goswami

Piya Sen Gupta

Arunima Saha

Tanaya Chatterjee

Namita Verma

Abhijeet Hazra

Pujari Food Team 2019

Secretaries

Sushmit Mukherjee

Samik Saha

Elder's food distribution

Sreerupa Sengupta

Anamika Pal

Sudakshina Mukherjee

Jhumpa Chatterjee

Jaba Chaudhuri

Manas Dey

Pujari Food Team 2019

Prasad distribution

Rupa Hazra

Subhra Banerjee Sarkar

Tania Majumdar

Namita Verma

Mukta Saha

Sonia Nandi

Monolina Roy

Arunima Saha

Kids food distribution

Anika Bhattacharya
Team lead

Hiya Ray

Proma Choudhury

Ishani Saha

Aryan Hazra

Pushan Dutta

Siddhant Mukherjee

সূচিপত্র - Table of contents

কবিতা / Poems

Subhasree Nandy	আয়না, দূরে ও কাছে	1
Sharmila Roy	Painting	2
Dr. Jharna Chatterjee	আলোর গান	3
Siben Mazumdar	কবিতা	4
Chaitali Mukherjee	Painting	5
Sutapa Das	আমার সরস্বতী	6
Suhas Sen Gupta	Painting	7
Sushmita Maholanobish	অনৃত	8
Arati Sen Gupta	Photography - A temple in Ayutthaya	9
Manas Dey	বিল্টু	10
Dr. Swapan Chaudhuri	Photography - Ladakh	11
Richa Sarkar	যদি সম্ভব হয়	12
Moushumi Paul	Painting	13
Sanjeeb Kumar Paul	তিন না চার	14
Sharmila Barua	Painting	15
Debarati Mitra	বড়ো আমি হতে চাই	20
Chaitali Mukherjee	Painting - Mother and child	17
Anima Mazumdar	Negative - Positive না - হ্যাঁ	18
Ruma Das	Painting	19
Arindam Deb	কোঁচা চুরি	20
Dr. Soumava Sen	Painting	21

Runu Seth	আজি এ বসন্তে	22
Paroma Mukhopadhyay	Painting	23
Amit Chaudhuri	Sweet Shop.	24
Malobika Deb	Alpana	25
Dr. Arabindo Ghosh	Stray thoughts for…	26
Dr. Sharmistha Ghosh	Painting	27
Srija Sen Gupta	There is sleep in my soul.	28
Arati Sen Gupta	Photography - Barisal Bangladesh	29
Satabdi Sarkar	Enchanting Teesta	30
Sucheta Mukherjee	Painting	31
Ruchira Paul	Twisted path.	32
Chaitali Mukherjee	Painting - Dancing in joy	33
Tapasya Sen Chunder	Waiting for you.	34

গল্প / Story

Soumik Mukherjee	Photography - Sunset at Mesa Arch	35
Swati Mukherjee	সন্দেহ	36
Jaba Chaudhuri	খুশির ঠিকানা	38
Palash Bhattacharya	স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা	41
Sikha Karmakar	প্রকৃতির রূপ	46
Kalpana Banerjee	তর্পন-তৃতীয় ভাগ	47
Somnath Chattopadhyay	সেলিনথিপের দেশে	52
Samaresh Mukhopadhyay	Photography	67
Runa Mukherjee Parikh	Maya	68
Urmi Dutta Roy	My journey through grief and the long road ahead.	72
Sudeshna De	Painting	75

প্রবন্ধ / Article

Piya Sen Gupta	আমার চোখে কাজী নজরুল ইসলাম	76
Nasir Ahmed	রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট	79
Seemita Chakrabarty	ঋষিকেশের পথে	82
Anima Mazumdar	আন্তর্জাতিক নারীদিবস	84
Shabnam Surita	দূরপাল্লার যাত্রাগান	88
Nupur Mukherjee	ভোজন রসিক বাঙালি	90
Soumya Bhattacharya	খেলার উৎপত্তি	92
Saikat Das	Photography	93
Asit N Sen Gupta	The bygone days of Atlanta.	94
Dr. Ranita Sen	Reminiscences.	98
Swapan Mondal	Letting go.	99
Arundhuti Dutta Roy	The Happiness Project.	100
Deepak Ganguly	Royal Bengal Tigers.	104
Asit Kumar Bhattacharya	Kriya Yoga.	106
Ambarish Mitra	The condimental saga of mustards.	112
Piya Sen Gupta	Painting	116
Sreerupa Sen Gupta Banerjee	Recipe.	117
Sukanya Mukherjee	Painting	119

Kids Kingdom (Children's section)

Poems

Ahana Chaudhuri	Artwork	121
Trinav Banerjee	Lining up.	122
Tarnija Sarkar	Artwork	123
Srinika Dutta	White winter	124
Akansha Sur	Artwork	125
Avinash Paul	Who am I?	126
Mihika Chatterjee	Artwork	127
Sanayah (Raina) Basu	A better place.	128
Anisha Bhattacharya	Artwork	129

Articles

Ishani Dutta	Importance of culture.	130
Rayaan Maiti	Artwork	131
Arushi Mazumdar	Dadu.	132
Avinash Paul	Artwork	133
Anandita Mitra	Horseback riding experience.	134
Piyush Roy	Artworks	137
Ayush Roy	Artwork	138
Tvisha Saha	Artwork	139
Siddhant Banerjee	Artwork	140
Shayna Banerjee	Artwork	141
Snigdha Mukherjee	Artwork	142
Siddhant Mukherjee	Artwork	143
Arshia Dutta	Artwork	144
Sahana Mondal	Artwork	145
Rishima Saha	Artwork	146

শুভশ্রী নন্দী
আটলান্টা

আয়না

তোমার মনের আয়নাতে ভেসে

রাত হয়ে যায় ভোর

মুখামুখি হলে কেন যে কাটেনা

আঁধার কালো ঘোর।

দূরে যেতে যেতে আরো কাছে আসি

খুঁজে পাই বন্দর

কাছে এসে দেখি যেন নদী জুড়ে-

শুধুই বালুর চর।

দূরে-কাছে এই লুকোচুরি খেলা

দোলনায় দোলে ছল

আমি কাছে আছি, তুমি হয়ে মনে

চোখে চিকচিকে জল।

দূরে ও কাছে

ফোঁটা ফোঁটা জলে
স্বপ্নেরা খেলে
বুদ্বুদ ওড়ে বাতাসে।
শ্বাস নিশ্বাসকে
ছুঁতে চায় যেন
একান্তে ভালোবেসে।

চোখে চোখ রেখে
হাতের ওপর হাত
আকাশ নেমেছে সেদেশে,
ধুকপুক বুক
ভরা তাতে সুখ
মন ছোটে কার নির্দেশে?

তারাগুলো যেন
কথা হয়ে ফোঁটে
হিমরাতে যেন বোঝাপড়া
যত কিছু বাঁধা
ছিলোএলোমেলো
পায় যেন সব আস্কারা।

ছোঁটে মন দূরে
ইশারার সুরে
সবটুকু সুখ কেড়ে নিতে
বৃষ্টির ফোঁটা জাপটায় মেঘ
দূরে গিয়ে আরো কাছে পেতে।

Artist- Sharmila Roy

আলোর গান

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী

কানাডা

(আলোক চিত্র – ঝর্ণা চ্যাটার্জী)

আলোয় আমার ভরা চারি ধার,
সারা দিনে রোদের বৃষ্টি,
সারা রাতে তারার পারাবার।
সবুজ পাতায় আলোর ঝলক - নদীর জলে আলো,
ঢেউয়ের ছল ছল গানে শ্রবণ-প্রাণ মাতালো।

ঘাসে ঘাসে নূপুর বাজে হাওয়ার মন্দিরাতে
পাখির ডানায় প্রতিধ্বনির সাথে –
সারি বেঁধে চলেছে ঐ কোন সুদূরের পথে।

মহাকাশে শান্ত নীহারিকা
রহস্যময় রঙিন আলোর শিখা,
আপন মনে গড়ছে গ্রহ নক্ষত্র-মালিকা
যুগ-যুগান্ত, কোনও কালের নেইকো সেথায় দেখা।

হেথায় আমি অস্থায়ী অতিথি,
নেইকো জানা কেন এলাম, দেখতে পেলাম

জগত ভরা আলোর চিত্র বীথি –
ভাবনা আমার, দুঃখ আমার, আশার কণা, আনন্দ-সম্ভার,
প্রতি দিনের মুহূর্তেরই বিশাল বোঝা, বয়ে বেড়াই বিপুল
তারই ভার,

আমায় ব্যাকুল করে রাখে সকাল-বিকেল, রাতের
অন্ধকার-

এই জগতে কী দাম আছে তার?
যেদিন যাব চলে,এই জনমের খেলার শেষে এই দেহটি
ফেলে,
থাকবে না আর চিহ্ন কোথাও
জলে স্থলে ফুলের শত দলে।

ভাবতে পারে হয়তো কেউ তখন,
ভালয়-মন্দে ছিল সে-একজন,

হৃদয় ছিল ভালবাসার –
সবার দুঃখে কাঁদত তারই মন,
হোক না সে পর, কিংবা হোক আপন।

চোখের জলে ডুববে না কেউ জানি।
হয়তো দুদিন মনে হবে ফেলে-যাওয়া গানের কলি খানি,
‘ভালবাসি, ভালবাসি’ আমার প্রিয়, মধুরতম বাণী।

ভোলার দিনে-রাত্রে জমবে ধূলো,
স্মৃতির পাতা নিমেষে ফুরলো,
নতুন এসে পাতবে আসন – নটে গাছটি একান্তে মুড়লো।

গাইবে জগত আনন্দময় গান,
উড়বে পাখি, করবে কলতান,

নতুন চোখের আলোয় ছটায় দেখা দেবে
নতুন দিনের উদ্ভাসিত প্রাণ।

শিবেন মজুমদার
আটলান্টা

কবিতা

তোমাকে একটা নামেই
ডাকতে চেয়েছিলাম।
যখন মৃদু জোৎস্নায় মন্থরতা নামে
নদী গুলি হেসে ওঠে।

গাছে গাছে পাখিরা ডানা ঝাঁপটাতে শুরু করে।
মৃত্যু আর জীবনের মধ্যে আয়ু কে এখন
একমুঠো বালির চেয়ে মূল্যবান মনে হয়না।
এখন শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়া কে
ঋতুর ঘোড়া ভাবতে ইচ্ছা হয় না
উদ্যানময় এই শরীরে
চোরের মত ফুল ছিঁড়ে ছিলাম।

উদ্যানময় এই শরীরকে
আমি ক্ষুধার অক্ষরে ভরে দিয়েছিলাম।
তোমার নিটোল দুটি চোখে
এত ভালোবাসা অথচ
তবু আমি চোখ নিচু করি।
তোমার নিটোল দুটো নীল চোখে
এত নিবিড়তা
তবু আমি ছেঁড়া পাপড়িগুলি
জোড়া দিয়ে উঠতে পারিনা।
সবুজ ঘাসের হিম আর একটা নদী
সারাটা দিন সারাটা রাত্রি
আমার রক্তে চিৎকার করে কবিতা।

Artist- Chaitali Mukherjee

সুতপা দাস
আটলান্টা

আমার সরস্বতী

আমার সরস্বতী
ঘোলা জলে গামছায় ছেঁকে
শামুক গুগলি খোঁজে
মরা গাঙে।

আমার সরস্বতী
মুখ নিচু করে
ঠোঙা বানায় ঘাড় গুঁজে
দুটি মুড়ির আশে।

আমার সরস্বতী
আলো আঁধারে ভীত
জঙ্গলের হিংস্রতায়,
অসুন্দরের কোলাহলে।

আমার সরস্বতী
ছেলে কোলে ভিক্ষা করে
দক্ষিণেশ্বরের মঠে
পড়ন্ত বেলায়।

আমার সরস্বতীর
দুই চোখে
বোবা হয়ে যাওয়া যন্ত্রণা
রক্তজমাট কালশিটে আর বেদনা।

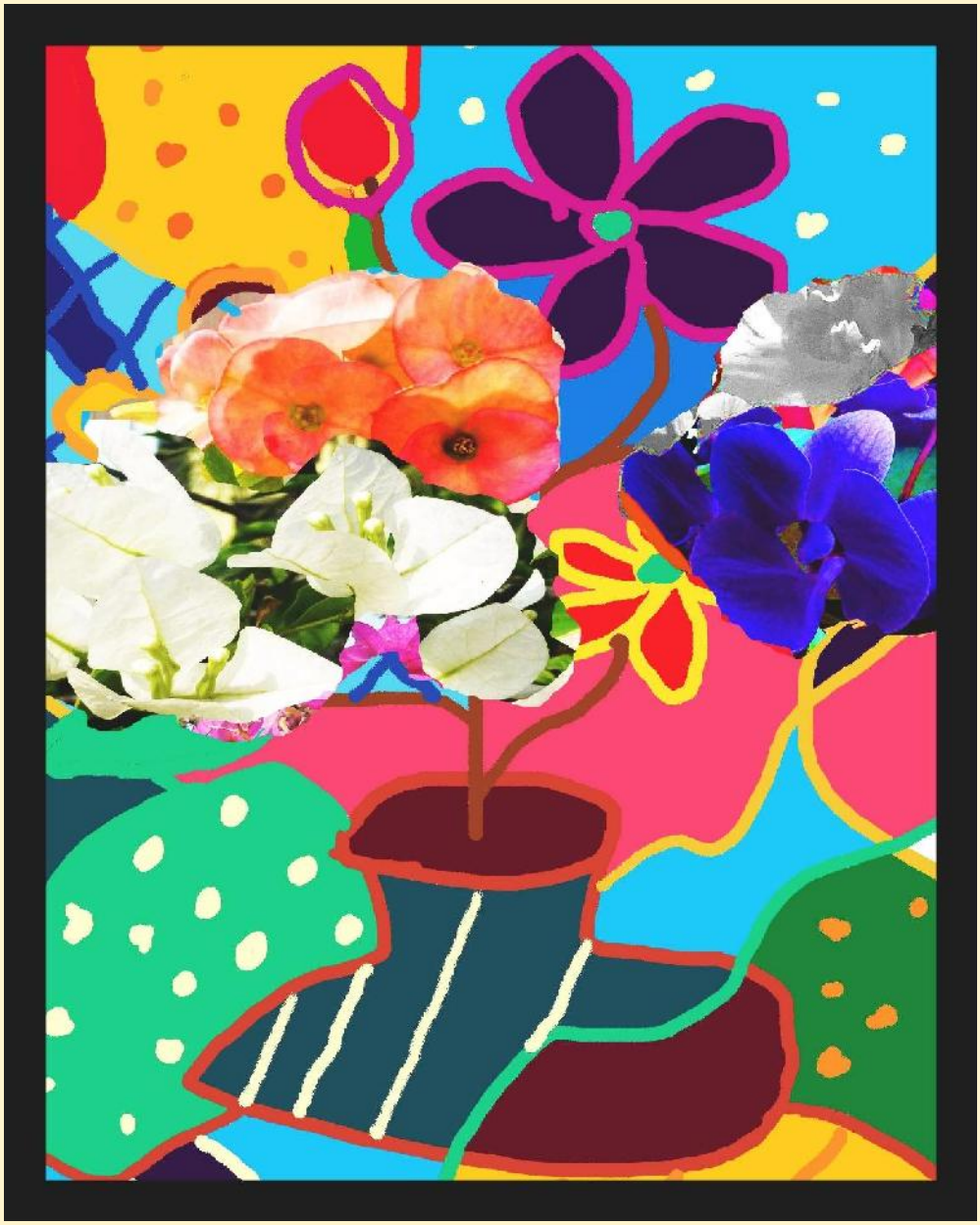

Neo pop art

Artist- Suhas Sen Gupta

সুস্মিতা মহলানবীশ
আটলান্টা

অনৃত

তুমি বড় সুন্দর হয়ে ধরা দাও ভূমন্ডলে

তোমার মনোহারিণী দৃষ্টি,

মুখোশ পরা সুন্দর হাসি,

মনমাতানো বাক্যালাপ

পরশ পাথর নিয়ে ছুঁয়ে থাকে তাঁর কোল।

আসল সত্য চাপা পরে থাকে ধোঁয়াশার নীচে।

বাহবা ধ্বনি গুলি শূন্য কলসির মতো

বড় শব্দ নিয়ে বাজে

আর প্রজ্ঞাচক্ষু আঁচল চাপা দিয়ে

চোখ দুটি মোছে।

-A temple in Ayutthaya, the old capital city in Thailand.

Artist- Arati Sen Gupta

মানস দে
আটলান্টা

বিল্টু

ক্লাস থ্রী তে পড়ি আমি
নামটি আমার বিল্টু,
ভোর চারটায় উঠি কিন্তু
ভুল হয় না ও একটু।
বাবার স্বপ্ন ডাক্তার হই
মা এর ইঞ্জিনিয়ার,
মধ্যিখানে স্বপ্ন আমার
হয় যে চুরমার।
এই বয়েসেই কুইজ করি
আমি জানি অনেক কিছু,
জল কে বলে H2O
পেরুতে মাচু পিচ্চু।

সাঁতার, ড্রয়িং, গিটার
কিছুই যে নাই বাকি,
চরিত্র গঠন হচ্ছে জেন
না থাকে কিছু ফাঁকি।
স্কুল থেকে যাই কোচিং ক্লাস এ
কোচিং থেকে গিটার,
গিটার শেষে করি আমি
এপার ওপার সাঁতার।
ব্যালকনি তে বসে দেখি
রোদ বৃষ্টির খেলা,
পেছন থেকে বাবা বলে
রামধনু নয়, বেনিয়াসহকলা।

খোকন, টোটোন, তাতাই
যখন নিচের মাঠে খেলে,
রুটিন মেনে ছুটি আমি
আমার খেলা ফেলে।
দিনের শেষে ক্লান্ত দেহে
ঘুমোতে যখন যাই,
স্বপ্ন দেখার আগেই কেন
অ্যালার্ম বাজে হায়।
মা কে শুধাই বলতে পারো
স্বপ্ন কেমন হয়?
তোমরা তো সব স্বপ্ন দেখো
আমার কেন ভয়?
স্কুলের ব্যাগ অনেক ভারী
স্বপ্ন বয়ে বেড়াই,
বাবা মার স্বপ্ন শুধু
আমার কিছুই নাই।

মানুষ হতে চাই না আমি
অমানুষ ই ভালো,
পিঠের বোঝা হালকা করে
মানুষ গড়ে তোলো।
পিঠের বোঝা হালকা করে
মানুষ গড়ে তোলো॥

Artist- Dr. Swapan Chaudhuri

রিচা সরকার
আটলান্টা

যদি সম্ভব হয়

যদি সম্ভব হয় আমাকে ডেকে কখনো জিজ্ঞেস করো, "ভালো তো?"
যদি সম্ভব হয় আমাকে ডেকে কখনো বোলো
"আমার কিছু কথা ছিল, সময় আছে?"

যদি সম্ভব হয় আমাকে ডেকে প্রশ্ন করো
"তোমার কি হয়েছে? আজকাল এতো কম কথা বলো কেন?"

যদি সম্ভব হয় একদিন ফোন করে বলো
"আজ শুক্তো রেঁধেছি, আসবে নাকি?"

যদি সম্ভব হয় তোমার সদ্য পড়া কবিতাটি
অনলাইন এ পাঠিয়ে বলো "পড়ে দেখো"...

যদি সম্ভব হয় ভাগ করে নিও বিষন্নতা
কোনো এক একলা দুপুরে...

যদি সম্ভব হয় তুমুল ঝগড়ার পর
কোনো এক ছুতোয় কথা বলার চেষ্টা করো...

যদি সম্ভব হয় সাফল্যের কথা কায়দা করে নয়, সরাসরি জানিও ।

যদি সম্ভব হয় ভাগ করে নিও
চোখের জল ...

সত্যি বলছি ফেসবুকে "Good morning!"
আর WhatsApp এ "Good night!" এর জীবন কাটিয়ে এসেছি

কুড়ি কুড়ি বছর আগে

Artist-Moushumi Paul

সঞ্জীব পাল
মুম্বাই

তিন না চার?

তিন নিয়ে গল্প অঢেল
তিন পাত্তি, ত্রিকোণ প্রেম
বারমুডা ত্রিকোণের টান
কিঞ্চিৎ হয়েছে সমাধান?

তবে কিনা বাহুল্য একেবারে
হেলাফেলা যায় না তাহারে
তৃতীয় নয়নে যাহা দেখি
চেতনায় মৃতপ্রায় থাকি

ত্রিকোণমিতির ভালবাসা
এভারেস্ট পর্বত মেপে আসা
তিনের খেলারা নয় সোজা
হৃদয়ের ওঠানামা বোঝা

তার চেয়ে চার বেশ পাতি
বদলাবে না রাতারাতি
টানাপোড়েনের মাঝখানে
চার বেশ কাছে টেনে আনে

চারে চেনা দিক প্রয়োজনে
ভারে কাটে দিন আয়োজনে
খেলা খেলা সারাবেলা কাটে
চার চোখ, এক হয়ে ওঠে

নোনতা চোখের জল এলে
চার ভাগে ভাগ করে নিলে
যদি চার হেসেছে গৌরবে
আলিঙ্গনে এক হয়ে যাবে

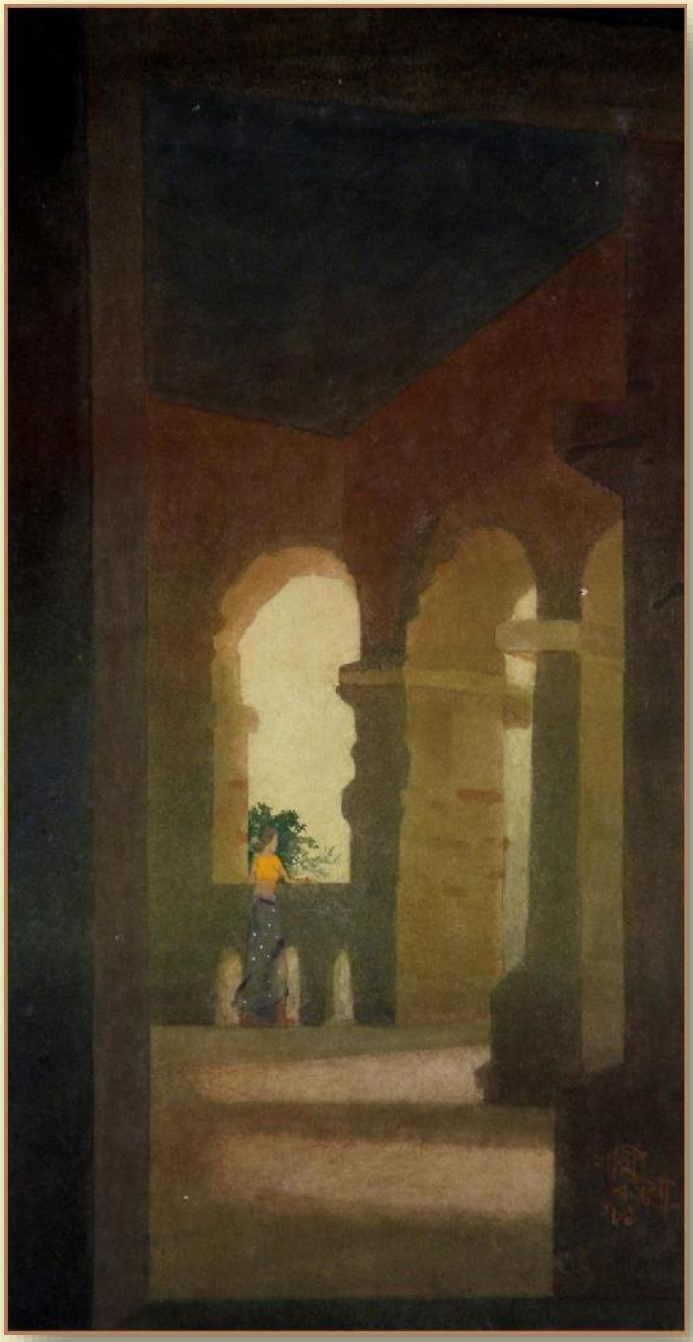

Artist- Sharmila Barua

দেবারতি মিত্র
আটলান্টা

বড়ো আমি হতে চাই

বড়ো আমি হতে চাই, বুড়ো আমি হবো না,
জ্ঞানের মহাসাগরে ডুব আমি দিতে চাই,
আড়ম্বরের সাহারায় বেদুইন আমি হবো না।

বড়ো আমি হতে চাই, বুড়ো আমি হবো না,
ভালোবাসা আমি প্রানভরে পেতে চাই,
জীবনযুদ্ধে বিজয়ী আমি হতে চাই,
সফলতার ভাঁড়ে ভঙ্গুর আমি হবো না।

বড়ো আমি হতে চাই, বুড়ো আমি হবো না,
আকাশের বুকে ডানা মেলে ভেসে আমি যেতে চাই,
ধ্রুবতারাকে হাতের মুঠোয় আমি পেতে চাই,
সোনায় মোড়া রাজপ্রাসাদের ঝাড়বাতি আমি হবো না।

বড়ো আমি সত্যিই হতে চাই,
কিন্তু, বুড়ো আমি হবো না॥

-Mother and child

Artist- Chaitali Mukherjee

অনিমা মজুমদার
আটলান্টা

নেগেটিভ - পজেটিভ

না - হ্যাঁ

দুই বিপরীত মেরু
বিষম রেখায় বিভক্ত-
শীত গ্রীষ্মের ক্ষরতায়
জীবনের মেরু দণ্ড,
বিষম প্রবাহে বাঁকা ধনু ,
আপন টঙ্কারে দৃঢ় সাবলিল-
শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গর্ভতা
প্রতিনিয়ত,
দুইয়ের যুক্তি তর্কে কুপোকাৎ -
যেন দুই প্রতিবেশী-
শিক্ষা সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত
ধ্বস্ত বিধ্বস্ত --
ঠিক বেঠিকের কুপোকাৎ লড়াই চলে
রক্ত চক্ষু আর বুকের ব্যথায়-
কেউ বলে তোমার এক গালে চাপড়ালে
তুমি পাত,
তোমার আর এক গাল--
কেউ বলে, তোমার একগালে চাপড়ালে
তুমি চাপড়াও তার দুই গাল-
কেউ হয় জাতির পিতা
কেউ হারিয়ে যায় অজানায়--
অনন্ত জীবন যাত্রা--
আছে ঢিল পাটকেল ।
বন্দুক বোমা যুক্তিতর্ক ।
সভা সমিতি-
নেগেটিভ পজেটিভের
আগে পিছে দৌড় ঝাঁপে
হারিয়ে গেছে বাল্য শিক্ষা--
“বড় যদি হতে চাও
ছোট হও তবে”--
হারিয়ে গেছে আদর্শ শিক্ষা
“ ক্ষমা মহতের ধর্ম” ।।
শুধু গুল দস্তা নিয়ে
ছোটা ছুটি নয়,
ঢিল টি খেলে
পাটকেলটি মারতে হয়--
গুরুজন শ্রদ্ধা ভক্তি
সব নেগেটিভ বার্ত্তা--
পজেটিভ--
গুরুকে গরু করে-
তোমার হালে
যুতে দাও--
মার্জিত হতে হ’লে
অমার্জিত ভাষার
হোক উত্তরণ-
নেগেটিভের ভোট বাক্স উপছায়-
পজেটিভ শুখা ফল-
প্রকৃতি দিয়েছে প্রাণ-
জীবনে ঠিক বেঠিকের কোলাহল-
আদর্শের ভরা বুকে
ঘুরে মরে শূন্যতা--

Pastel painting on suede board.

Artist- Ruma Das

কোঁচা চুরি॥

অরিন্দম দেব, কলকাতা

ফেনি গিলে রাত দেড়টায়
শান্ত যখন ফিরলো,
সবাই তখন জানতে কারন,
তাকেই ঘিরে ধরলো!

গোয়ারই এক ডর্মিটরি,
সে এক বিশাল ঝকমারি,
শান্ত তখন অশান্তিতেই-
কলঘরেতে ঢুকলো!

অবস্থা তার খুব সঙ্গীন,
সবকিছুকেই দেখছে রঙীন,
শুধু কেবল ভাষা মুখের
শুনে ইজ্জত পুড়লো!
বেরিয়ে এসে শান্ত বলে
“পরবো আমি ধুতি!
দেখনা, আছে, বাক্সে তোরা
ময়ূরপুচ্ছ, সুতি!”

ঘুমের চোখে ডর্মিটরি
হলো যে তছনচ্!
বন্ধুরা সব খুঁজতে ধুতি,
জুড়লো ছুঁচোর নাচ!

একে তখন রাত সে দুটো,
চোখেতে ঘুম গাদা,
ওই শান্ত বেটার অশান্তি হায়
যায় না চাপা দাদা!

অবশেষে মিললো ধুতি
গরু খোঁজার পর,
শান্ত বলে-"দীপ্তরে,
তুই মালকোঁচাটা ধর!"
চললো তখন সাজের ঘটা
কলকাতারই বাবু!

দীপ্ত ব্যাটা সে আবদারে
সম্পূর্ণই কাবু!
গুনতে গুনতে ধুতির কোঁচা
ভাঙলো ধীরযবাঁধ,
দীপ্ত টেনে শান্তকে হায়
মারলো পিছে লাথ!

পপাত চ মমার চ
এরপর কি হলো,
কোঁচা ধুতি সহ দুজন
ভূতলে লুটিলো!

ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতন রেগে
ছুটতে থাকে গালি,
কলকাতারই মান বুঝি যায়
বাঁচাও হে মা কালী!
সবাই মিলে, সামাল দিতে
এ যজ্ঞে যোগ দিলো,
কোনোমতে ভুজুংভাজুং
ব্যাপারটা সামলালো!

ভোরের দিকে, উঠে শান্ত অশান্ত ফের
হলো-
দীপ্তরে কয়, "চোর কোথাকার
এটা কি হোলো?"
দীপ্ত এবার কাঁদো কাঁদো
বললো "আবার কি?"
শান্ত বলে "চোরের চুরি!
কেউ কি দেখিসনি?
যখন ব্যাটা মারলে লাথি
বাইশ কোঁচা ছিলো,
এখন সেটা দেখছি উনিশ,
বল কি করে হলো?
বাইশ ছিলো, উনিশ হলো,
বাকি যেটা তিন,
দীপ্ত শেষে চোর হলি হায়!
ভাবতে গা ঘিনঘিন"!

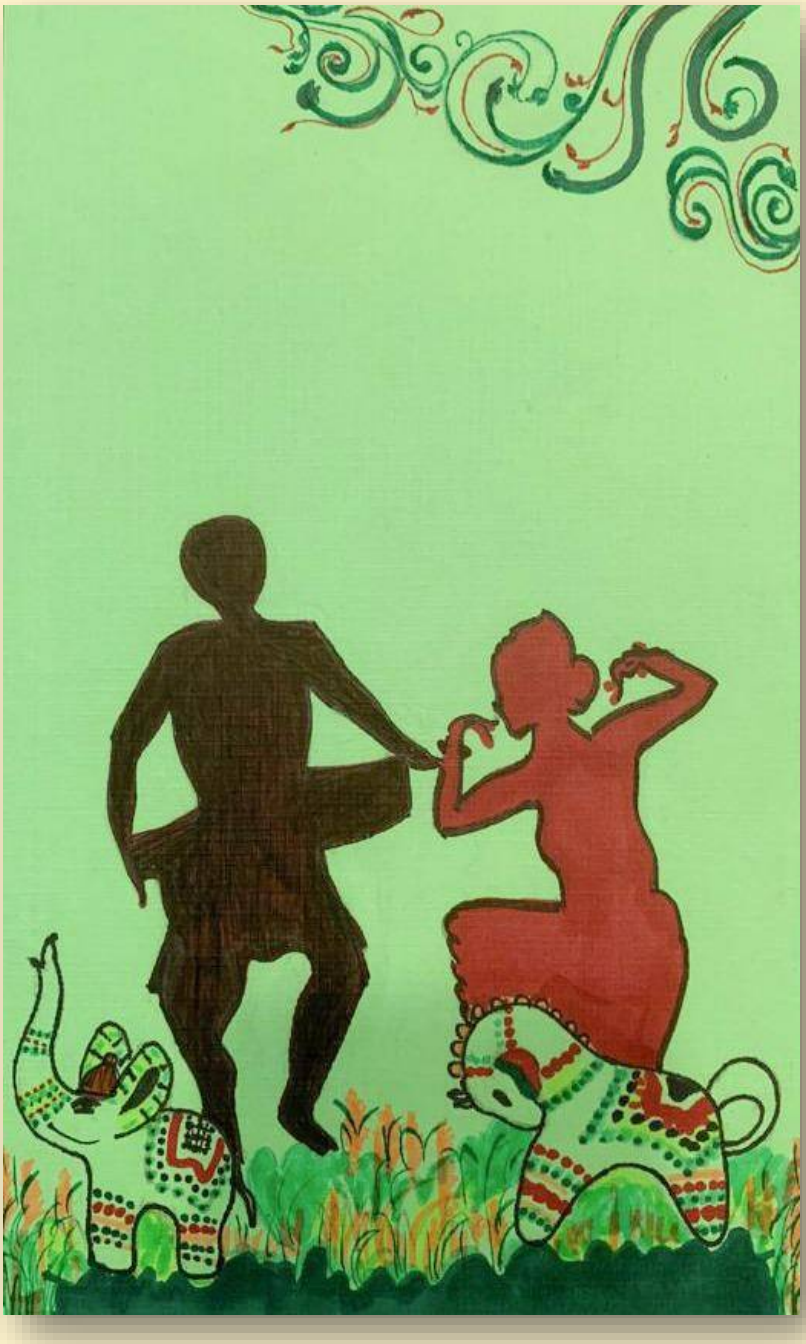

Artist- Dr. Soumava Sen

রুনু শেঠ
দুর্গাপুর

আজি এ বসন্তে

আমার পলাশ এলো নীল হয়ে সেজে
বললাম,'' কই এ তো আনন্দের রং নয়!
ও বললো,তবে সাজিয়ে নাও আমাকে
মনের মতন করে।
তাই, হাতে রং তুলি নিয়ে,
বসেছি সাজাতে ওরে,
রাঙিয়েছি লাল রঙে,
থাকুক হৃদয়ে ঢাকা নীল।
তবু তো পলাশ আছে লাল।

Artist- Paroma Mukhopadhyay

Amit Chaudhuri
London and Kolkata

Sweet Shop

The whole universe is here.

Every colour, a few

on the verge of being barely tolerable.

Every shape as well as minute flourishes

created in the prehistory

of each sandesh by precise pinches.

The horizontal trays

brim (but don't tremble) with mass and form.

The serrations are near-invisible.

You'd miss them if they were deeper or clearer.

The soft oblongs and the miniscule, hard

pillow-shaped ones are generated

so neatly that instinct alone

could have given them shape, and no mould.

In the harmony shielded by the glass

is an unnoticed balance of gravity and play.

Amit Chaudhuri is the author of seven novels, the latest of which is *Friend of my youth*. He is also an essayist, poet, musician and composer. His second book of poems, which came out in January, is *Sweet Shop*. He is a Fellow of the Royal Society of Literature. Awards for his fiction include the Commonwealth Writers Prize, the Betty Trask Prize, the Encore Prize, the Los Angeles Times Book Prize for Fiction, and the Indian government's Sahitya Academy Award. In 2013, he was awarded the first Infosys Prize in the Humanities for outstanding contribution to literary studies. In 2017, the government of Bengal awarded him the Sangeet Samman for his contribution to Indian classical music. He is the professor of Contemporary Literature at the University of East Anglia.

-Alpana

Artist- Malobika Deb

Dr. Arabindo Ghosh
Dhanbad

Stray Thoughts For…….

If I walk back in time
Will you be mine?
This time, on my knees
Holding a solitaire
To see you say “yes”
And your eyes glare.

Love has no language
Thoughts have no bar
Wishes are flying horses
Riding on clouds afar.

A flurry of images
Just keep passing by
Some born of yearning
Some born of learning
And others too……
Before memories die.

Artist- Dr. Sharmistha Ghosh

Srija Sengupta
Atlanta

There is Sleep in my Soul

Between red arteries and blue veins
That stitch together to make me whole
Between bone marrow and blood cells
There is sleep inside my soul

Yawns crack my heart open
Sighs of the mind take their toll
And there, on tender muscle it lies
There is sleep inside my soul

Eyes fall shut in the bright of night
And in the deep of day, dreams roll
Through the gaps in my joints, you can see
There is sleep inside my soul

Guts and secrets safely tucked inside
I lay down, exhausted and dry-eyed-
For there is sleep in my soul

-A scene from Barisal Bangladesh

Artist- Arati Sen Gupta

Satabdi Sarkar,
Kolkata

Enchanting Teesta

The graceful curves of vibrant Teesta
The smoothened shingles tumbling down.
Pine trees praise its own vista
Being mirrored in water aquamarine.
Dignified mountains cast silent glance
With perseverance and indulgence.

The sun--kissed pristine white sands,
Over there the dense vegetation so green.
The buzzing of insects, the song of the birds
The roaring of a distant falls unseen.
An aura of mysticism waved by the wand
Of a bevy of fairy angels from Fairyland.

Can you hear the poignant tale?
Lingering in the pervading atmosphere
Narrated by smoking chimneys in the vale
Or witnessed by weathered rocks so sheer?
Some dreams unfulfilled, a love forlorn,
Perhaps the lore of a spent day or a new dawn.

As I stood there long and motionless
My thoughts I immersed in the swirling waters
And encountered each, drowning under the surface.
What was left with me was just a haze.

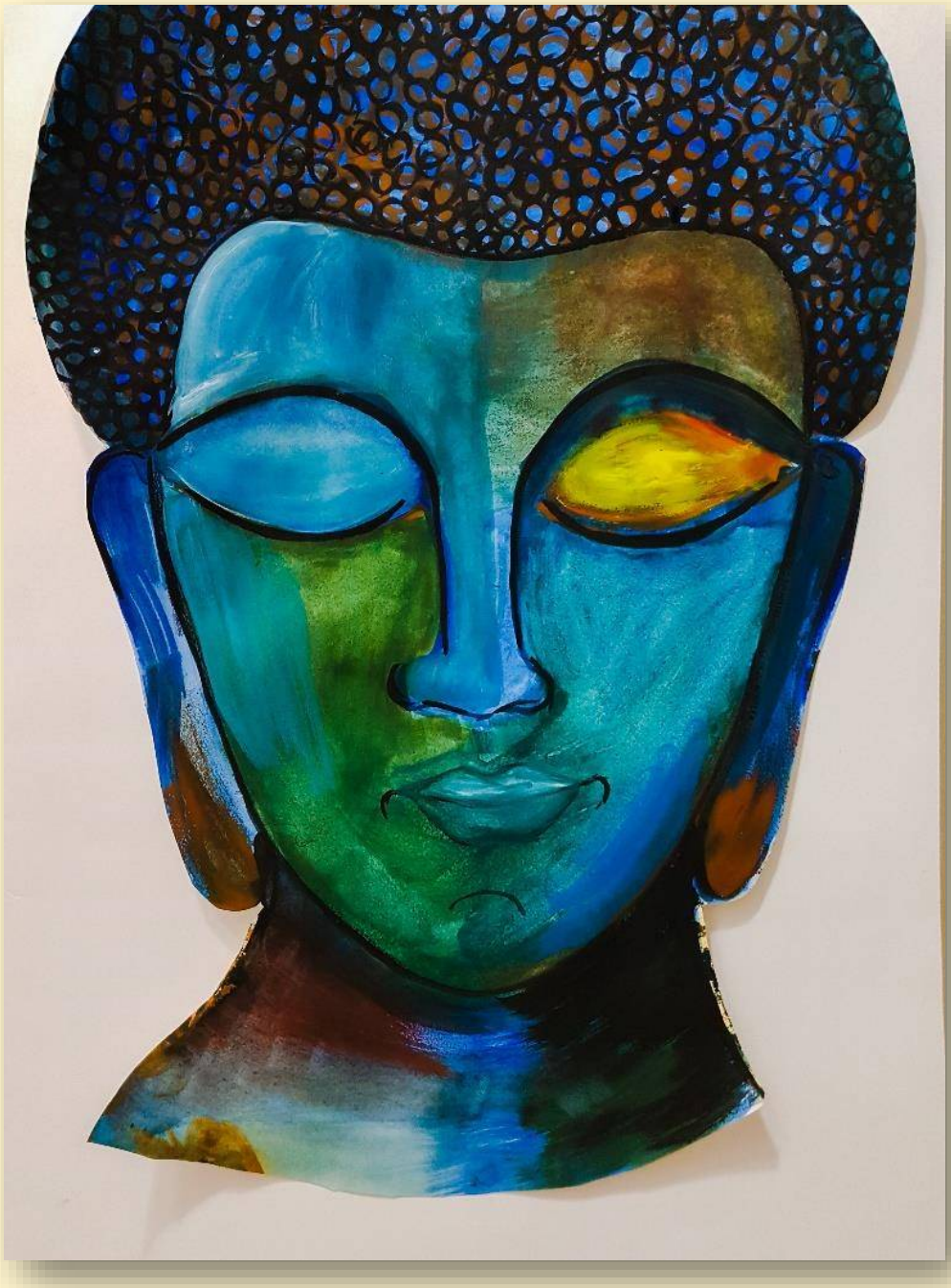

-Buddha

Artist- Sucheta Mukherjee

Ruchira Paul,
Mumbai

Twisted path

Life is a twisted path. You think you have the GPS all figured out and are on the correct highway but let midnight come and you haven't reached halfway yet and you are screwed. No destination here has a correct road and no road here has a correct destination.

When I was 13, I wanted to be an engineer because I was the only one in the family who could Skype my sister on the other side of the country.

At 16, I realized how stupid my genius was to choose Bohr over Dante and Milk over dark chocolate because I have always loved brushes over stencils. I have struggled my way through learning science that did not make sense to searching for art which was nonsensical.

At 17, I found out that writing is a solution to my dark chocolate problem and that regret smells like M&Ms. I realized that I could speak better than I could balance equations. The equations of my life have stripped down naked- they rejoice in non-conformity.

At 18, I have figured out life, the universe and everything. And the answer is not 42.
I have realized that life is a fortune cookie. It will hint you with a bad hair day because it is always a bad hair day. Or maybe because he was going to ask you out today and of course you had to look stupid. Life is as unpredictable as an earthquake and as easy to figure out as a Rubik's cube. But I have barely made my way in.

I know of fairy tales which are real and reality which is a fairytale but I do not know of potholes here and there. So instead I always carry my parachute because someone told me that to fly in is the only way out.

-Dancing in joy

Artist -Chaitali Mukherjee

Tapasya Sen Chunder
Atlanta

Waiting for You

Waiting for you dawn and dusk
While the magic thrives
Silent and thrusting heartbeats
Wait for you the whole life

Nervous and shy I feel
With heartbeats which hove
Because it's thrilled with
The trembling feeling of first love

I gravitate towards you
Yet seek for lee
But always waiting for you
Because I love thee.

Sunset at Mesa Arch, Utah

Artist- Soumik Mukherjee

স্বাতী মুখার্জি
কলকাতা

সন্দেহ

এমন পিঠ খোলা অথচ ফিতে বাঁধা একটা ব্লাউজ পরেছে মেয়েটা যে রাতুল সহজেই ভাবতে পারলো ওর নগ্ন শরীর টাকে। চোখ ঘুরিয়ে নিলো। অনেকদিন পূর্বার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই । ডিভোর্স ফাইল করা হয় নি। রাতুলকে ছেড়ে চলে গেছে চার মাস হয়ে গেল। কারণটা অতি সামান্য। অতি সামান্য টাই তিল তিল করে বেড়ে একটা পাঁচিল হয়ে গেল।

রাতুল নাকি রাস্তায় বেরিয়ে মেয়েদের দেখে। কি আশ্চর্য! রাতুল কি চোখ বুঁজে চলবে নাকি? মানতেই চায় না পূর্বা। রাতুলের মধ্যে এমন কিছু আছে, মানে রাতুলের তাকানোর মধ্যে, যে মেয়েরাও নাকি রাতুলের দিকে তাকিয়ে দেখে। ওদের সাথে নাকি একটা কিছু হয়ে যায় রাতুলের। সেখান থেকে শুরু করে একেবারে এক নারীতে রাতুল সন্তুষ্ট নয় পর্যন্ত বলে তবেই পূর্বা থামতো।

ডিসগাসটিঅং।

রাতুলের কলেজের পরিচিত পামেলা একদিন মেট্রোতে উঠল। সে স্লিভ লেস লাল টপ আর সাদা একটা প্যান্ট পরে উঠেছে। দেহে সুবাস। চুল ছাড়া । ঠোঁটে গ্লসি কিছু লাগানো। আট্রাকটিভ তো বটেই। হাই হ্যালোর বেশি একটাও কথা হয় নি। “কেমন আছো রাতুলদা, অনেকদিন পর, এই তোমার বৌ? আমি এই একটু নন্দনে যাচ্ছি” । ব্যস এইটুকুই। কি কান্ড করলো যে পূর্বা বাড়ি এসে! রাতুল নাকি ওর দিকে সাত বার তাকিয়েছে। আর দুয়েকবার ওর দিকে তাকানোর পরই নাকি ও আরো রাতুলের দিকে সরে আসে। তখন ওর শরীরের গন্ধও নাকি রাতুল পেয়েছে। সেদিনও বাড়ি এসে কান্নাকাটি। একটা এপিসোড পুরো। রাতুলকে ঐ কলেজে পরিচিত মেয়েটার পাশে শুইয়েই দিলো প্রায় ঝগড়ার ঘোরে, "যদি পার্টনার চেঞ্জ করাটা সমাজ স্বীকৃত এবং লোকচর্চার বিষয় না হতো তাহলে তুমি ওর সাথেও বোধহয়” ...

রাতুল বোঝাতেই পারলো না যে পামেলাকে সেরকম কিছু মনে হলে রাতুল পূর্বাকে কেন বিয়ে করবে, পামেলাকেই তো করতে পারতো। এমনকি এটাও বলল,"বেশ। এখন যদি - মানে আজও যদি অতই আকর্ষণ বোধ করতাম, ওর ফোন নাম্বার নিতাম। লুকিয়ে দেখা করতাম। মোটকথা তোমার সামনে কোনও কথাই বলতাম না।

বিশ্বাস তো করলোই না। পুরোনো পুরোনো আরও ইনসিডেন্ট তুলল। রাতুল হাঁ করে শুনলো। লেটেস্ট হচ্ছে ওর শুভ দৃষ্টির সময়ে শুভ দৃষ্টি সেরে চোখ নামানোর পরেই নাকি ওর পাশে থাকা ওদের পাশের বাড়ির ভাড়াটে মেয়ে টার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছে যে রাতুল ওদের বাড়িতে গেলেই মেয়েটি বারান্দাতে চলে আসে।আর সারাদিন ওখানেই থাকে।

"আর কোনও দিনও তোমাদের বাড়ি তে যেতে বলো না আমাকে" - বলে সেদিনের মতো কথা শেষ করলো রাতুল। এখন তো চারমাস হয়ে গেল পূর্বা বাপের বাড়ি তেই থাকে। আর, এখন, হ্যাঁ এখনই সত্যি বলতে কি রাতুলের অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

"এক্সকিউজ মি! জায়গা আছে কারোর?" রাতুলের পাশের সিটে বসার জন্য জিজ্ঞেস করছে মেয়েটি ।
"না তো। "---- একটু সরে গেল রাতুল। মেয়েটি বসে পড়লো।
"জল নেই না আপনার কাছে?"------জিজ্ঞেস করলো।

রাতুলের ব্যাগে জল আছে। ব্যাগ বাঙ্কে তোলা। আর মেয়েটাও! নিজে জল আনতে পারে নি! মেয়েরাই তো সাধারণত জল টল গুছিয়ে নিয়ে বের হয়। রাতুল বলল,"আছে। কিন্ত পাড়তে হবে। মাথার ওপর। ব্যাগে।
মেয়েটা একবার করুণ চোখে ওপর দিকে তাকালো।
রাতুল উঠল । ব্যাগ নামালো। জল বের করলো। মেয়েটা কে দিলো। হাফ বোতল শেষ। অফিস থেকে বেরোনোর সময় রাতুল বোতলটা পুরো ভরে বেরিয়েছিল ।
জলটাও ঠিক করে একটু খেতে পারে না। কিছু টা নিজের শাড়ি তে ফেলল। কিছুটা চলকে রাতুলের প্যান্টে।
"এবাবা!! দাঁড়ান দাঁড়ান।" রুমাল বের করছে। সাংঘাতিক টাইপের ক্যাবলা তো! রাতুল ,"ঠিকাছে। আছে রুমাল আমার কাছে।" বলে উঠেই দাঁড়াল। তারপর "একটু সাইড দিন তো!" বলে বেরিয়েই দাঁড়ালো। মেয়েটা এবার লজ্জা পেলো।"আসলে শরীরটা আজ ঠিক নেই। এইসব শাড়ি পরে,,,,, একটা অনুষ্ঠানে গেছিলাম,,,,,আপনি বসুন না!"

মেয়েটা কে রাতুল জানলার দিকে সরে বসতে বলল। তারপর নিজে একটু বেরিয়ে ওকে স্পেস দিয়েই বসলো। বাসটাও ছেড়ে দিলো। এই প্রথম রাতুলের একটা অদ্ভুত ইচ্ছে করছে। মেয়েটার সাথে পরিচয়টা বাড়ুক। গাঢ হোক। পূর্বার এতদিনের কান্নাকাটি অভিযোগ আজ সত্যি হোক।

রাতুল প্রশ্ন করে জানলো মেয়েটা রাতুলের পরে নামবে। আর একটা ছোট্ট অনুরোধ করলো নিজের ফোনটা বের করে,"কিছু মনে না করলে, আপনার নম্বার টা আমাকে দিন তো। মানে শরীর খারাপ বলছিলেন,,, বাড়ি ঠিকমত পৌঁছোলেন কিনা জেনে নিতাম।"

মেয়েটা রাতুলের চোখে চোখ রেখে হাসলো। ফোন নাম্বারও দিলো। একটা অন্য রকম খুশি নিয়ে রাতুল বাড়ি ফিরলো। বন্ধ গেটের সামনে অন্ধকারে সিঁড়ির ওপর কে বসে আছে?? পূর্বা!!!!

অভিমান অভিযোগ না। পূর্বা আজ ঘর করতেই ফিরে এসেছে। রাতুলের কাছে। নিবিড় হতে চায়। ওদের দুজনের সামনে এমন কোনও মেয়ে আজ দাঁড়িয়ে নেই, যাকে নিয়ে অত কথা পূর্বা বলতে পারবে। শুধু রাতুল জানে আজ যদি পূর্বা ঐসব কথা গুলো বলতো রাতুল প্রতিবাদ করতো না।

জবা চৌধুরী
আটলান্টা

খুশির ঠিকানা

বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত ভারতের উত্তরের রাজ্য 'জম্মু ও কাশ্মীর' এর শুধু কাশ্মীর নিয়েই ভেবেছি। আর কাশ্মীর সম্পর্কে অনেকটাই জেনেছি বিভিন্ন লেখকের ভ্রমণ কাহিনী থেকে। তারপর ২০০৯ সালে প্রথমবার সেই ভূ-স্বর্গকে নিজের চোখে দেখার সুযোগ যেদিন এলো, তার মাটিতে পা রেখে ধন্য হয়েছি নিজে। এ তৃপ্তির কোনো তুলনা হয় না।

২০১৭ সালের গরমের ছুটি তখন। আমার বর স্বপন আর ছেলে তুতাই দু'সপ্তাহের জন্য সুদূর আমেরিকা থেকে প্রথমবারের মতো গেলো লাদাখ ভ্রমণে। আর সেই থেকে ভারতের উত্তরের রাজ্য 'জম্মু ও কাশ্মীর' এর 'জম্মু', জায়গা করে নিলো আমাদের মনে- নানা কথায়, নানান সৌন্দর্যের তুলনায়। প্রাথমিক ভাবে সে সব শুনলাম স্বপনের কাছ থেকে। তারপর ২০১৮- এর গরমের ছুটিতে সুযোগ এলো সেই গল্পের লাদাখকে নিজের চোখে দেখার। এবার সপরিবারে হলো আমাদের যাত্রা। দেশের পরিবারও আমাদের সাথে যোগ দিলো দিল্লীতে। তারপর বারো জনের দল পা বাড়ালাম লাদাখের দিকে।

নতুন কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলেই আমার ভীষণ ক্ষিধে পায় সময়ে অসময়ে। সেদিনও শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছেই মনে হলো না খেয়ে আমি আর এক পা-ও চলতে পারবো না। ওই এয়ারপোর্টের নিয়মকানুন অনেক। অগত্যা পোর্টাররা ভরসা। ওরাই আমাদের জন্য কিছু খাবার এনে দিলো।

শ্রীনগর থেকে আমাদের লাদাখ যাত্রার আসল অধ্যায় শুরু। সামনে শুধুই পাহাড়ি বিপদ সংকুল পথ। একটা মিনি বাস আর সাথে একটা গাড়ি রিসার্ভ করে রাখা ছিল। সবাই যে যার মতো উঠে বসলাম। দিল্লীর কুয়াশা-ধুয়াশা মেশা ভারী হাওয়ার পর আমাদের শ্বাসনালীতে কাশ্মীরের ওই নির্মল হাওয়ার মুক্ত বিচরণ সত্যিই ছিলো অনুভব করার মতো!

এশিয়ার দীর্ঘতম নদী সিন্ধু, কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে এই সোনামার্গ অঞ্চল হয়ে হিন্দুকুশ সীমান্তের দিকে। ওই নদীর গা ঘেঁষে এক মনোরম পরিবেশে একটি ছোট্ট রেস্টুরেন্ট- সেখানে আমরা থামলাম লাঞ্চের জন্য। ঠিক তার পাশের দোকানটিই ছিল কাশ্মীরি জামাকাপড়ের। আমাদের দলের নারীবাহিনী খাবারের বদলে হানা দিলো ওই দোকানে! বাকিরা চলে গেলো বাইরে নদীর ধারে সাজানো বসার জায়গায় রিলাক্স করতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খবর এলো ওই রেস্টুরেন্টে শুধুই নিরামিষ খাবার পাওয়া যায়। জানতাম আগে চলতে চলতে আগামী দশদিন নিরামিষই খেতে হবে। তবুও প্রথম ধাক্কা। দাঁড়িপাল্লার একদিকে আমার ক্ষিধে আর অন্যদিকে ডাল-সবজি ফেলে ওজন নিলাম বেশ করে। জানি, এই খাবার নিয়ে আমি অমত করলে ছোটদেরকে সামলানো কঠিন হবে। তাই জোর করে পাঁচ-সাতটা দাঁত বাইরে এনে খুশি খুশি মুখ করে বললাম, "দারুণ!" যাইহোক, সেই খাবার কিন্তু বেশ ভালোই ছিল। আর চলতে চলতে দশ দিনের খাবারের অভিজ্ঞতার গ্রেডিং করলে এখন অবশ্যই বলবো, সেই খাবার উঁচু গ্রেড পাবার যোগ্য ছিল।

লাঞ্চ শেষ হতেই বেরিয়ে পড়তে হলো আমাদেরকে। কারণ সামনের রাস্তা ছিল দূর্গম। ড্রাইভাররা বারবার তাড়া দিচ্ছিলো। সন্ধ্যা হবার আগে কার্গিল পৌঁছাতে হবে। রাস্তা খুব খারাপ। এতো বড় দলকে সময়ের সাথে চালানো চাট্টিখানি কথা নয়। ড্রাইভারদের তাড়া শুনে 'ভীরু'রা চটপট গাড়িতে উঠে বসে গেলো। কার্গিল পৌঁছনো অব্দি ওরা আর নামবে না ঠিকও করে ফেললো। আর ততক্ষণে 'সাহসী'রা সুন্দর দৃশ্য দেখলেই গাড়ি থামিয়ে নামবে, এই প্ল্যান করে ফেলেছে। আমার পা দু নৌকোয়। ভয়টা কীসের সেটা পরিষ্কার নয়। তাই ভয়। কিন্তু এতো দূরে এসে সব না দেখে চলে যেতেও আমি চাই না। যাইহোক, ফাইন্যালি সব জায়গায় সবাই নামলো। প্রকৃতির ওই সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া যায় না। যদিও মুখের ওপর "মাগো, কী হবে"- এই প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমাদের অনেকেরই ছিল।

কার্গিল পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেলো। হোটেলের ঠিকানা জানা সত্বেও ড্রাইভাররা অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় পথ হারালো। তখন বুঝলাম ওদের তাড়া দেবার আসল কারণ। হোটেলে আমাদের ডিনার রেডি ছিল। প্রচন্ড জেট ল্যাগ, সাথে ক্ষিধে আর দীর্ঘ পথের ক্লান্তি- গরম জলে শাওয়ার আর গরম গরম খাবারের পর টেবিল ছাড়ার আগে সবাইকে একবার শুধু 'গুড নাইট'ই বলতে পেরেছিলাম- যতদূর মনে পড়ে। সে রাতে আর কারো সাথে গল্প-আড্ডা হয়নি।

ভ্যাকেশনে গেলে ভোর হয়েছে কিনা আমাকে ঘড়ি দেখে বলতে হয় না। হোটেল হোক বা, দেশের বাড়ি- কানের কাছে খুব হালকা স্বরে একটা লাইন ভেসে আসে...."জবা, আমি একটু বেরোচ্ছি।" অর্থাৎ, আমার কর্তা মহাশয় গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। সেদিনও তাই হলো। ভাগ্নে রাজকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো স্বপন L.O.C. সীমান্ত দেখে আসতে। আমরা বাকিরা ঘুমালাম নিজেদের হিসেব মতো।

প্ল্যান মতো সকাল দশটার দিকে ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কার্গিল দেখে সেদিনই আমরা যাবো লামায়ুরু। গাড়ি চলতে শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের চোখ বড় বড় হতে লাগলো হিমালয়ের রূপ দেখে। সকালের রোদের সোনারঙে চারদিকে দাঁড়ানো হিমালয়ের পর্বতমালা বর্ণময় হয়ে যেন আমাদেরকে বলছে 'জুলে' (Julley)! কাউকে স্বাগত জানাতে, সম্মান জানাতে লাদাখের লোকেরা বলে 'জুলে'। মন কেড়ে নেয়া সেই ডাককে উপেক্ষা করা গেলো না। গাড়ি থামিয়ে সবাই আমরা নেমে পড়লাম। পাহাড়ের গা বেয়ে যতোটা সম্ভব উপরে চড়লাম আমরা। যাদের হাতে ক্যামেরা ছিল, সবারই চোখ তখন লেন্সে।

কার্গিলের ৮৭৮০ ফুট থেকে যতো ভেতরে যেতে লাগলাম উচ্চতা ততই বাড়তে লাগলো। দুপুর নাগাদ যখন লামায়ুরু পৌঁছোলাম, উচ্চতা তখন ১১,৫২০ ফুট। হোটেলে বুকিং দেওয়া ছিলো আগে থেকেই। অত্যন্ত সুন্দরভাবে হোটেলের লোকেরা আমাদেরকে আপ্যায়ন করলো, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলো।

লাঞ্চ এর পর আমরা দেখতে গেলাম লামায়ুরু মনাস্টারি(monastery)। হোটেল থেকে দেখে মনে হয়েছিল খুব কাছেই এই মনাস্টারি। তাই দল বেঁধে হেঁটে রওয়ানা দিয়েছিলাম। পরে মনে হলো পথ যেন আর শেষ হয়না। চড়াই এর শেষপ্রান্তে পৌঁছে যখন ওপরে তাকালাম- এক অস্বাভাবিক মুগ্ধতায় মন ভরে গেলো। নির্জন, শান্ত পরিবেশে পরিশ্রান্ত হৃদযন্ত্রে নিজেরই জোরে জোরে নেওয়া প্রতিটি শ্বাস যেন সদর্পে জানাচ্ছিলো বেঁচে থাকার মূল্য। মনে আসা প্রতিটি ভাবনাকে মনে হচ্ছিলো নিখাদ। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল নিঃস্তব্ধ মনাস্টারিটিকে মনে হলো যেন সবকিছুর সাক্ষী। মন্দিরের সবচেয়ে ওপরের দিকে সাজানো ছিলো ছোট বড় অনেক সাইজের প্রার্থনা-চক্র বা praying wheel। স্থানীয় লোকেদেরকে দেখলাম মন্ত্র পড়ে পড়ে ওই চাকাগুলোকে ঘোরাতে। আমিও নিজের মতো করে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে।

নেমে আসার পথে ওদের প্রধান সন্ন্যাসীর (monk) সাথে দেখা হলো। অমায়িক মানুষ। সকলের সাথে কথা বললেন। আমাদের অনুরোধে সকলের সাথে বসে ছবিও তুললেন। উচ্ছ্বাসহীন অতুলনীয় ভালোলাগা ওই সন্ধ্যার কথা মনে করতে গিয়ে, লিখতে বসে, আজ আমি উচ্ছ্বসিত! ইট, কাঠ, পাথরে বাঁধানো শহুরে জীবনে বসে ফেলে আসা ওই নির্মল ভালোলাগা সময়ের মূল্য বোঝানো কঠিন। জানি, মনের কোনো এক গভীরে জেগে থাকা এক টুকরো খুশিই শুধু তার শেষ ঠিকানা।

আলোক চিত্র - ডক্টর স্বপন চৌধুরী

পলাশ ভট্টাচার্য্য
কলকাতা

।। স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা ।।

"চানাচুর নকুলদানা, বাবুদের জন্যে আনা,
খোকা খাবে খুকু খাবে আর খাবে খোকার ঠাকুমা। "

সেই লোকটা আজ আবার এসেছিল। বিকেলের আলো যখন কমতে শুরু করে তখন। এমনিতে গরমকালের এই সময়টাতে বিকেলটা অনেক বড় বলে খেলার সময় অনেক বেশি পাওয়া যায়। এখন আমার ক্লাস সেভেন। সেই সাড়ে চারটেয় ইসকুল থেকে ফিরে যাহোক কিছু মুখে দিয়েই খেলা শুরু আর সেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে গুটি গুটি পায়ে বাড়ি ফেরা। আর কয়েক দিন পরেই ইসকুলে গরমের ছুটি শুরু হবে। তখন তো আরো মজা। সকালেও খেলার সময় পাওয়া যাবে। খেলা ছাড়াও তখন আরো অনেক মজা আছে সারাদিন। বুল্টুদের বাগানের গাছ থেকে বড় বড় নোনা পেড়ে সেগুলো তুষকুঁড়োর বস্তার মধ্যে পাকাতে দেওয়া হবে। একদিন পরে সেসব তুলতুলে হয়ে উঠলে বিকেল বেলা মাঠে সকলে ভাগ করে খাওয়া হবে। তার সাথে সারা সকাল রোদ্দুরে মারবেল পেটার পরে নতুনপুকুরে ঝাঁপাই জুড়ে স্নান। মা যতই সাবধান করুক ওসব রোদ্দুর ফদ্দুরে কিস্যু হবে না। পুকুরের ধারে একটা সজনে গাছের ডাল থেকে " বাবা তারকনাথের চরণে সেবা " বলে ঝপাং - চোখ টকটকে লাল না হওয়া পর্যন্ত।

এখন কারেন্ট চলে গেছে। খাওয়ার পরে গরমের জন্য তিনতলার ছাতে একটা সতরঞ্চি পেতে শুয়ে আছি। একটু দূরে দাদু হাতপাখা নেড়ে চলেছে। ছাতের চারপাশে চুপচাপ ভূতের মত নারকেল গাছগুলো দাঁড়িয়ে। ঝড়ের সময়ে ওগুলোই দেখেছি হেলে দুলে কি কান্ডই না করে। চোখের সামনে মাথার ওপর অন্ধকার আকাশে অনেক তারা। একটু লালচে মঙ্গল, উজ্জ্বল বেস্পতি আর ঐটা সপ্তর্ষিমন্ডল। বড়পিসি চিনিয়ে দিয়েছে । তারারা সত্যিই মিট মিট করে জ্বলে কিনা মাঝে মাঝে সেটা বুঝতে পারি না। তবে বইয়ে যখন লেখা আছে তখন নিশ্চয়ই করে। ইন্দ্রজাল কমিকসের ফ্ল্যাশ গর্ডন পৃথিবীর বাইরে বিভিন্ন গ্রহে ঘুরে বেড়ায়। তবে আমার ওর গল্প পড়তে খুব একটা ভাল্লাগে না। তারচেয়ে বেতাল, বাহাদুর, ম্যানড্রেক অনেক ভাল। শেওড়াফুলিতে ছোটপিসির বাড়িতে এবার গিয়ে যে সংখ্যাটা পড়লাম সেটাতে বেতালের হেব্বি ঝাড়পিট ছিল। লাইব্রেরিতে ইন্দ্রজাল কমিকস পাওয়া গেলে বেশ হত। কাল শঙ্কুর পান্ডব গোয়েন্দা বইটা ফেরৎ দিতে হবে। ওটা কৈলাশ পাঠাগারের বই। আমাকে পড়তে দিয়েছে। হারালে বিপদ।

দূরে মাঠের দিক থেকে মাইকের গান ভেসে আসছে। সেই এক দুজে কেলিয়ের গানটা। সত্যম শিবম্ সুন্দরম্ । গতবছর বড়মামার বিয়েতে অনেকবার শুনেছিলাম। ছোটপিসির বাড়িতে রেকর্ডের গান আছে। তাই সেটা চালাতে জানতাম। রেকর্ডের পিনটা তুলে গানের আগে আলতো করে বসিয়ে দিলেই চলত অদ্ভুত গানটা। বাপাই মামা বলছিল ওই গানটা

নাকি অনেক হিন্দি সিনেমার নাম জুড়ে জুড়ে তৈরি। আচ্ছা, কেলিয়ে তো খারাপ কথা। সেটা সিনেমার নাম হল কি করে? টিভিতে ক্রিকেট খেলার সময়ও বলে 'চার রান কে-লিয়ে'। হিন্দি ভাষাটা অদ্ভুত হলেও হিন্দি সিনেমা দেখতে কিন্তু দারুন লাগে। তবে টিভিতে যেগুলো দেয় সেগুলোতে তেমন মারপিট থাকে না। গতবছর পরীক্ষার পর দিদিকে অনেক পটিয়ে মোহন সিনেমাহলে একটা হিন্দি সিনেমা দেখেছিলুম, জুগনু। ধরমেন্দরের সিনেমা। এখনও মনে আছে। বচ্চনের সিনেমাও একটা দেখেছি তার আগের বছর পুজোর সময়। সেটা বাংলা হলেও বেশ ভালোই ছিল। এ বছর লবডঙ্কা।

লোকটা আগের বছরও দু একবার এসেছিল। ঠাকুমারা চানাচুর খেতে ভালোবাসে কিনা জানিনা তবে এই গানটা আমার খুব ভাল লাগে। শুধু আমার না, পাড়ার সকলেরই। লোকটা একটা ফেরিওয়ালা। কালো জামাকাপড়। কোমরে সাদা কাপড় বেল্টের মত করে বাঁধা। মাথায় একটা নেতাজীর মত সাদা টুপি। কাঁধে সাদা ঝোলা। মুখে রঙচঙ মাখা আর চোখে একটা লাটুর ঠাকুমার মত গোল ফ্রেমের চশমা, যার কাঁচ নেই। অনেকটা বড়দিনের সেই সাদা দাড়িওয়ালা বুড়োটার মত। তার মধ্যে বোঝাই জ্যমিতির শঙ্কুর মত দেখতে কাগজের ঠোঙায় মোড়া চানাচুর নকুলদানা। পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তালে তালে গান গেয়ে সেগুলো বিক্রি করতে আসে। প্রথম দিন ভেবেছিলুম বহুরূপী। বাংলা বইতে যেমন আছে ছিনাথ বহুরূপী। আমাদের পাড়াতেও আসে তো। কালী, মনসা, শিব, নারদ নানারকম সেজে। সে চলে আর আমরা পিছনে পিছনে চলতে থাকি। ভোঁদাটা বদমাশ। সেবার নারদের ধুতি টেনে খুলে দিয়ে পালিয়েছিল।

এই লোকটা একটা অন্যরকম ফেরিওয়ালা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অনেক ফেরিওয়ালা দেখা যায় হরিপালের এদিকটায়। সকালে যে ভোলাকাকা যুগান্তর কাগজ দেয় সেও তো খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা। কলতাতায় কসবার মামাবাড়িতে ইংরেজি কাগজ সুতুলি দড়িতে বেঁধে টিপ করে বারান্দায় ছুঁড়ে দেয়।

দাদু বলেছে ফেরিওয়ালাদের ইংরিজতে হকার বলে। অন্যদিনের কথা বাদ তবে আনন্দমেলা, শুকতারা, চাঁদমামা দেওয়ার দিন খুব মজা। সকালে যখন দেখি যুগান্তর আর দিদির পরিবর্তন পত্রিকার সঙ্গে জড়ামড়ি করে এ মাসের শুকতারাটা সদর দরজার সামনে পড়ে আছে তখন যে কি আনন্দ হয় যে কি বলব। এক নিঃশ্বাসে বাঁটুল আর হাঁদা ভোঁদা শেষ। গল্প আর ধারাবাহিক পরে। গতবছর শ্রাবনমাসের একটা রবিবারের দুপুরের কথা বেশ মনে পড়ে। এমনিতেই বর্ষার সারাদিন মেঘবৃষ্টিতে মনটা কেমন দুঃখী দুঃখী হয়ে থাকে। তার ওপর বাবা সেদিনে পাওয়া নতুন শুকতারার একটা বিদেশী গল্পে এক দুঃখী ভিখারীর কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছিল। বিদেশে অনেক জায়গায় নাকি বছরের অনেকটাই সময় অমন মনখারাপ করা আবহাওয়া থাকে। কেন জানিনা সেই রবিবারের দুপুরটা মনে রয়ে গেছে। একেই বোধহয় বলে মনে দাগ কাটা।

বেলার দিকেও আসে অনেক ফেরিওয়ালারা। মাথার ঝুড়িতে প্লাস্টিক আর অ্যালমুনিয়ামের জিনিস নিয়ে সুর করে হাঁক দেয় "হরেক মাল পাচসিকে···"। দুপুরের পড়ন্ত রোদে কখনও আসে কাঁসা পিতলের বাসন বিক্রির লোক। কাঁসা পিতলের বাসন, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিক্রি করে। দুজন থাকে। ধুতি আর ফতুয়া পরা একটা লোক থাকে সামনে। এক হাতে একটা কানা উঁচু ছোট বাটি আর একটা কাঠি নিয়ে বাজাতে বাজাতে যায়। মুখে কিছু হাঁক পাড়ে না। তার পিছন পিছন আর একজন, খালিগায়ে, মাথায় তার বিরাট ঝাঁকা বোঝাই থালা-বাটি-গেলাস। সবই কাঁসা-পিতলের তৈরি। ঐ বাসনগুলোর সামনের দিকটা ঝকঝকে পালিশ করা সোনার মত রঙ আর পেছন দিকটা কালো। ঐ বাটি বাজানোর আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারি চালতাপুকুরের পাড়ের রাস্তা ধরে বাসনওয়ালা আসছে। আমার একটা কাঁসর কিনতে খুব ইচ্ছে করে। দুর্গাপুজোর সময় ঢাকিদের সঙ্গে যেমন থাকে। আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের সময় বাজানোর জন্য একটা কাঁসর আছে । কিন্তু সেটা বড়

আর ভারি। বাজাতে বেশ কষ্ট। ঢাকিদেরগুলো ছোট আর হালকা। একটা ছোট ছেলেই তো বাজায়। গতবছর দু বাক্স বন্দুকের টিপ ক্যাপের বদলে একবার বাজাতে দেওয়ার কথা বলেছিলুম। বল্লে হবেনা, বাজানো শক্ত। তাল কেটে ফেলব। ঢাকের অনেক তাল । পাঁঠাবলি জয়মা, বিসর্জনের বাজনা, আরতির পাঁচ ছটা তাল, কিন্তু কাঁসির তো কেবল কাঁইনানা, কাঁইনানা ।

বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে টিনভাঙা, কাঁচভাঙা, বইখাতা, লোহালক্কড়ের জিনিস কিনতে আসে যে লোকগুলো তারা এবার অনেকদিন আসেনি। একটাকা দুটাকা কিলো। বদলবিস্কুটওয়ালারাও প্লাস্টিকের জিনিস নেয় কিন্তু পয়সার বদলে বিস্কুট দেয়। আমি কিছু জিনিসপত্তর জোগাড় করে লুকিয়ে রেখেছি। বিক্রি করলে বেশ কদিন ভোলার আইসক্রিম খাওয়া যাবে। ভোলা আইসক্রিমওয়ালা বেলা এগারোটা বারোটা নাগাদ আমাদের পাড়া দিয়ে যায়। তারপর টিফিনবেলায় আমাদের গুরুদয়াল ইসকুলে পৌঁছায়। ইসকুলে ছুটি থাকলে বেলা এগারোটার সময় ভোলার সাইকেলের ঘন্টা শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকি। ওর সাইকেলের সামনের চাকার স্পোকের সঙ্গে একটা সাইকেলের বেল লাগানো আছে। পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে ও সেটা কিভেবে পা দিয়ে চালু করে দেয় আর সাইকেলের চাকার ঘোরার সাথে সাথে অনেকক্ষণ ধরে একভাবে কিড়িমিড়ি কিড়িমিড়ি করে বাজতে থাকে। সাইকেলের পিছনে নীল রঙের বাক্স রবারের দড়ি বা সাইকেলের টায়ার দিয়ে বাঁধা। দশ আর কুড়ি পয়সার কাঠি আইসক্রিম। কয়েক জন মাথায় বাক্স নিয়েও আসে। আমাদের ইসকুলের একটু আগেই পিচ রাস্তার ডানদিকে আইসক্রিমের কলটা। বোম্বে আইস ক্যান্ডি। ভেতরে ঢুকে দেখেছি। অনেক ঠান্ডা বাক্সের মধ্যে থরে থরে সাজানো আইসক্রিম। বিকেলে ঠেলাগাড়ি নিয়ে আর একজন আসে। চৌধুরি আইসক্রিম। লাল কাপড় জড়ানো হাঁড়িতে কুলফি বরফ আর মালাই বরফওয়ালাও আসে মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে। দুটোই শালপাতায় দেয়। মালাই বরফের জলটা হুস করে টেনে নিলেই বাকিটা শুকনো ঘসা কাঁচের মত হয়ে যায়।

ফেরিওয়ালাদের অনেকে হরিপালেরই লোক। ইসকুলের টিফিনে আর বড়বাজারে যে ঝটপটওয়ালাটা আসে তাকে শীতকালে বাঁকে করে ধান বয়ে আনতে দেখেছি। একই লোক আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর যখন ধানকাটা মাঠে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে মেতে থাকি তখন যে লোকটা টিং টিং করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে একটা কাঁচের বাক্স করে হাওয়াই মিঠাই বিক্রি করে সে লোকটাই আবার বারোয়ারিতলার পুতুলনাচের আসরে একটা বাঁশের মাথায় বোম্বাইমিঠাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দুটোই বেশ মজার জিনিস। হাওয়াই মিঠাই হল কাঠির মাথায় গোলাপি রঙের বরিক তুলোর মত দেখতে, জিভে লাগালে ঠাণ্ডা, মুহূর্তে গলে যায় আর ঠোঁটের চারপাশটা চটচট করে। বোম্বাইমিঠাই হল একটা বাঁশের মাথায় বেশ খানিকটা সাদা বা গোলাপি চুইংগামের মতো চটচটে মিষ্টি একরকম বস্তু যা থেকে খানিকটা নিয়ে তা দিয়ে নানান জিনিস বানিয়ে বিক্রি করে এবং শেষ পর্যন্ত সেটা পেটেই যায়। আমাদের ক্লাসের একটা বন্ধু বলছিল ওর মামার বাড়ির দেশে হাওয়াই মিঠাইকে বুড়ির চুল আর বোম্বাইমিঠাইকে বলে চটরপটর। ইসকুলের ফেরিওয়ালা বন্ধু কিন্তু কেবল ইসকুলেই আসে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে দেখিনি। তবে মেলা বা যাত্রা নাটকের আসর বসলে সেখানে যায়। একটা পাঁপড় ভাজা বিক্রির লোক ছিল। সকলে 'ম্যাঁও' বলে রাগাতো। সে লোকটা অনেকদিন আর আসে না। মহাদেব বলছিল টিবি হয়ে মরে গেছে। পুজোর আগে পরে সাঁওতালদের একটা লোক দিঘির পানিফল তুলে ঝুড়িতে করে বিক্রি করতে আসে। তাকে দেখেও খুব মায়া লাগে। না কাটা দাড়ি, হাত পা গুলো শুকনো, পেটটা ফোলা। চুল্লু খেলে এমন চেহারা হয়, ফঁড়ুকাকার মত।

এই চানাচুরওয়ালা লোকটার মত অন্য জায়গার ফেরিওয়ালারাও আসে বৈকি। যেমন ডুগডুগি বাজিয়ে সাপখেলা আর

বাঁদরনাচ দেখাতে যে সব লোকগুলো আসে তাদেরকে এ চত্বরে দেখিনি। দিদি বলে ওরা বেদে। সাপুড়েদের কাঁধে বাঁকের দুদিকে বড় থেকে ছোট পরপর মাটি লেপা চুপড়ির মত গোল গোল বাক্স। তার মধ্যে কুন্ডলি পাকানো নানা ধরনের সাপ। আমাদের পাড়ার বুলুকাকা বেশ হুজুগে। সেবার বুলুকাকা টাকা দিয়ে খেলা দেখে ছিল। সঙ্গে আমরাও। বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। সাপুড়ে 'দেখুন বাবু শুনুন বাবুরা' বলে সব রকম সাপ চিনিয়ে দিচ্ছিল। তার মধ্যে লখিন্দরকে বাসর ঘরে কামড়ানো কালনাগিনীর কথাও বলেছিল। সাপে আমার খুব ভয়। তাই দূরে থাকি। তবে সাপুড়েদের বাঁশির সুরটা খুব সুন্দর। আর বাঁদরনাচও বেশ মজার। রাম সীতার খেলাতে বাঁদরটা এক লাফে সমুদ্র পেরিয়ে সীতাকে উদ্ধার করতে যায়। কখনো ধরমেন্দর আর হেমা মালিনী হয়ে তিড়িং বিড়িং করে ড্যান্স করে। ও পাড়ার ট্যারা তপনদের বাড়িতে একটা পোষা বাঁদর আছে। সেটা কেবল কিচকিচ করে মুখ ভেঙায়। ভালুকনাচ এখনও দেখিনি।

শিল কাটানোর লোকটাও এদিককার নয়। গতমাসে একদিন পীযুষদের বাড়ি এসেছিল। ও ইসকুল গেছিল কিন্তু আমি সেদিন যাইনি। তাই দেখেছি । হাতুড়ি দিয়ে শিল কাটার ছোট ছেনির মাথায় মারে আর ছেনিটা সরিয়ে সরিয়ে নানা রকম নকশা করে। আমরাও ঐরকম দাগ দিয়ে দিয়ে শিলকাটাকাটি খেলি পাড়ায়। মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি শিল কাটালে তাতে বাটনা ভাল বাটা যায়। একটা ছুরি কাঁচি ধার দেওয়ার ফেরিওয়ালা একবার দেখেছিলাম। ঘাড়ে করে একটা চাকাওয়ালা যন্ত্র নিয়ে এসেছিল। তা দিয়ে কেমন করে ধার দেয় সেটা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু আমাদের সবকিছু তো ষষ্ঠীতলার কামারশালা থেকে শানিয়ে আনা হয়। বাবার সাথে প্রায়ই রবিবার সকালে যাই কামারশালায় দাড়ি কাটার ক্ষুর শানিয়ে আনতে। একটা গোল পাথরের চাকা দড়ি দিয়ে আর একটা বেশ বড় চাকার সাহায্যে ঘোরায়। আর সেই ঘুরন্ত পাথরের চাকায় ক্ষুর ঠেকালেই সোনার রঙের আগুনের ফুলকি ছোটে। তার পাশে হাপর আর আগুনে লাল হয়ে যাওয়া লোহা পিটিয়ে কাঁচি তৈরি করাও দেখছি। শুনেছি এমন ভাবেই রাজাদের যুদ্ধের তলোয়ার বানানো হত।

আর এক ধরনের ফেরিওয়ালা আছে। সিনেমাওয়ালা। একটা বড় সবুজ রঙের বাক্স মাথায় নিয়ে আসে। তারমধ্যে আলমুনিয়াম দিয়ে বন্ধ করা কয়েকটা কাঁচ ঢাকা ফুটো। ওখান দিয়েই সিনেমা দেখতে হয়। তবে মোহন সিনেমার মতো না। ভিতরে লাইট জ্বলে আর নানা আর্টিস্টের ছবি আঁটা একটা কিছু ঘোরে। বাক্সের ওপরে রেকর্ডে গান চলে। যে সিনেমার গান সেটা সেই সিনেমা। আমি তো সেবার ডন দেখলাম আর বুড়ো দেখলো আনন্দ আশ্রম। কিন্তু পরে গল্প বলার সময় বুঝলাম দুজনে একই জিনিস দেখেছি। সেবার সূর্যগ্রহনের সময় টিভিতে পথের পাঁচালী সিনেমা দিয়ে ছিল। সেখানে অমন সিনেমওয়ালার দৃশ্য ছিল। গল্পটা আগে অনেকবার শুনেছি বাবা আর ঠাকুমার মুখে। সেই রেলগাড়ি দেখতে যাওয়াটা আমার খুব ভাল লাগে। টেলিগ্রাফের খুঁটির শোঁ শোঁ শব্দ। আমিও শুনেছি। মুসাপুর গ্রামে সুরুলদের বাড়ি যাওয়ার সময় মাঠের মাঝে। তবে বাবা বলেছিল ওটা টেলিফোনের তার।

এই কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বাড়ির লোক ভয় দেখাত যে এইসব ফেরিওয়ালারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। যদিও এখন আর ভয় পাই না তবু আজকে চানাচুরওয়ালাটাকে দেখে সেই হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্পটা মনে হচ্ছিল। সেদিন ক্লাসে ইংরাজির স্যার গুরুপদবাবু বলেছিল। স্যার পড়ার শেষে রোজ একটা গল্প বলে। এমন ফেরিওয়ালাদের গল্প ঠাকুমাও বলত। তার ছোটবেলায় আরো অনেক ফেরিওয়ালারা আসত। আজ থেকে অনেক বছর পরে এই সব ফেরিওয়ালাদের সংখ্যা হয়তো আরো কমে যাবে। এই লোকগুলো যখন কেউ এই পৃথিবীতে থাকবে না তখন এই চেনা হাঁকগুলো আর চানাচুরওয়ালার গান ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। তবে নতুন আরো ফেরিওয়ালা এদের বদলে নিশ্চয় আসবে। আমাদের মনের এই স্মৃতিগুলোও একদিন আবছা হয়ে আসবে। আমি ভাবছি সামনের বছর ইসকুলের স্পোর্টসের 'যেমন

খুশি সাজ' তে আমি ওই চানাচুরওয়ালা সাজব। কেমন হবে বলোতো ?
নতুন নতুন প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে ছোটবেলার সমস্ত ভাললাগাগুলো চোখের সামনেই কেমন করে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল সেটা ভাবতে বেশ অবাক লাগে। ছোটবেলার সেইসব চেনা রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ কেমন করে যেন তার রঙ হারিয়ে চাওয়া পাওয়ার হিসাবের পরিবর্তনের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলল। সেই শোনপাপড়িওয়ালার টিনের বাক্স নতুন নতুন বিনোদনের ভীড়ে, সবকিছু হাতের মুঠোয় পাওয়ার আনন্দে বিবর্ণ হয়ে এসেছে। এখন আর গ্রাম্য দেবদেবীর ষোলোআনা পূজোর জন্য ত্রৈলোক্যদাদুর মত ঢোল বাজিয়ে সুর করে ঢ্যাঁড়া দেওয়ার লোক নেই। কেবল্ চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের সাথে জুড়ে দিলেই হল। সেই আপাত সরল সাধারণ লোকলোকগুলোর বদলে এখন আরো নতুন নতুন আধুনিক ফেরিওয়ালার আবির্ভাব ঘটেছে গাড়ি, বাড়ি, বিলাস, বৈভবের হাতছানির পসরা নিয়ে। লোভ, বাসনা আধুনিকতার চটক হারিয়ে দিয়েছে ছোটবেলার সরল অনাবিল আনন্দকে। কালের অমোঘ নিয়ম মেনে চলতেই হয়। নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। সে বছর স্পোর্টসের গো অ্যাজ ইউ লাইকে চানাচুরওয়ালা সাজা আমার হয়ে ওঠেনি কিন্তু সেই পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো ফেরিওয়ালাদের স্মৃতি মনের মাঝে উজ্জ্বল সাজে রয়ে গেছে। এত বছরেও সেই চানাচুরওয়ালার গানের সুর আমাকে নস্টালজিক করে দেওয়ার জন্য কোনো মাধ্যমে বেজে ওঠেনি। কেবলমাত্র স্মৃতির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে রিনরিনিয়ে ওঠে-

"চানাচুর নকুলদানা, বাবুদের জন্যে আনা"

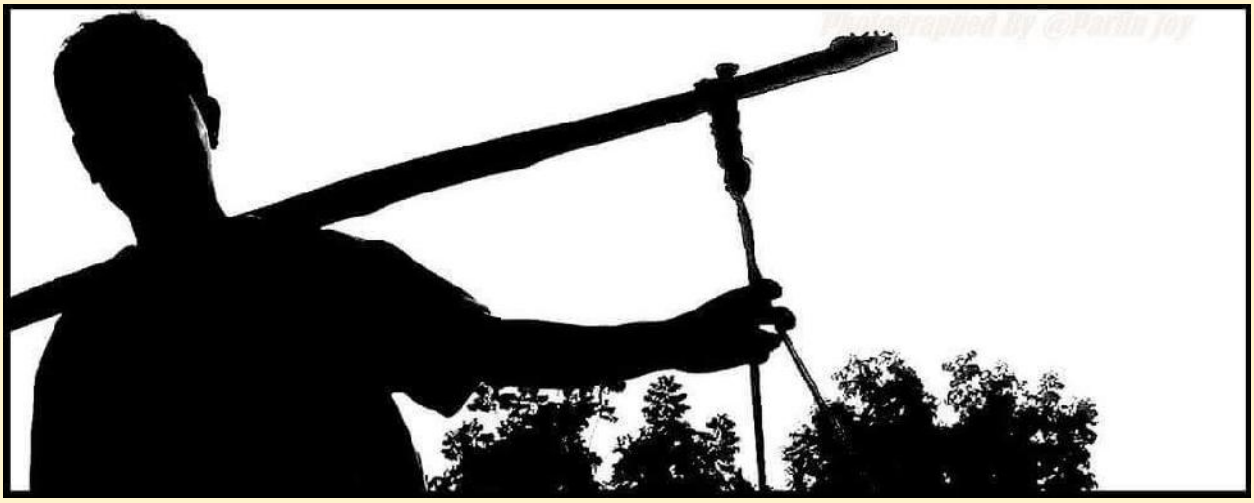

শিখা কর্মকার
আটলান্টা

প্রকৃতির রূপ

ভুট্টা ক্ষেতে ঝলসে উঠছে সকালের রোদ তার সোনালী চুল ছুঁয়ে, যখন পৃথিবীর বাকিটা ঘুমিয়ে আছে অন্ধকারে, আলোর গান যাদের ছুঁয়ে যায়নি সেই না জেগে ওঠা গঙ্গাফড়িঙেরা। কচুবনের ভেতরে ঘুমন্ত মাকড়সার জালে ঝিকিয়ে ওঠে হীরেকনা। এমন সময়ে আমি এই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকছি জেনে নিস্তব্ধ হয়ে গেল বনবনান্ত। একটি পাতার আড়াল থেকে চেয়ে রইল বাদামী পাখিটি তার শীর্ণ ছানাটিকে বুকের কাছে নিয়ে, লুকিয়ে থাকল কাঠবেড়ালিরা গোলাপি রঙের রোমহীন তিনটি অন্ধ শাবককে কোটরের ভেতর দিকে ঠেলে দিয়ে, সতর্ক দুচোখে দেখে নিয়ে মাথা নামিয়ে মিশে গেল বাসার রঙের সাথে পাটকিলে ও সবুজ হাঁসেরা, পেটের তলায় উষ্ণ হয়ে রইল তাদের অমুল্য ধনেরা। চুপ করে গেল বিশাল বৃক্ষের ডালে মিশে থাকা বহুরূপীরা, তাদের পায়ের কাছে বইতে থাকা খালের জল, সেখানে তৃষ্ণা মেটাতে আসা বুনো ঘোড়া জলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল, আর পাতার ডাঁটির পাশ হয়ে অজস্র জলপোকা আর ব্যাঙাচির দল দুই চোখে আলো জ্বেলে সাঁতার কাটতে লাগলো সাঁ সাঁ করে।

যত এগোই তত অন্ধকার হয়ে আসে বনের ভেতর। পায়ের নীচে অযুত-নিযুত-লক্ষ কোটি ঝরে যাওয়া ভিজে পাতা, ঝড়ে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে যাওয়া গাছ শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে, তার সবুজ প্রশাখায় এখনো ঘুমিয়ে আছে হাজার ককুন, চাদরের ভেতরে তাদের শরীর এখন গলছে, মিশছে, বানাচ্ছে জাদুডানা। ডানায় পরাগের স্বপ্ন, প্রবাহিত হতে থাকা আমেজি বাতাসের, ফুলের বুকে জমে থাকা সুমিষ্ট মধুর, অন্তহীন নীল আকাশের। বাতাস বদলাচ্ছে তার গতিবেগ, শান্ত হয়ে শুয়ে আছে ঘাস, তার ভেতরে কত যে জীবন এই নিস্তব্ধতার ভেতর তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠছে।

এইসব নির্জন সময়ে, আমিও উদ্ভিদের মত সহজ সরল আর সবুজ হয়ে উঠতে উঠতে ভাবি তোমার কথা, তোমারও তো পাতা হয়ে সূর্যালোকে আমার পাশে ঝলমলিয়ে ওঠার কথা ছিল। হয়তো খুব ব্যস্ত আছো অক্ষরের শরীর, শব্দের গাম্ভীর্য, আর পঙক্তিদের গুঢ় তত্ব নিয়ে, এতসব কিছু তেমন না বুঝেই একদিন আমি ওই অসংখ্য পাতাদের মত এই নাম না জানা বনে ঝরে পড়ে থাকবো। সাফারি করতে এসে এইখানে ভুল করে চলে এলে, হরিণের চোখে চোখ পড়লে তোমার হয়ত আচমকা দুলে উঠবে স্মৃতির পর্দা, ফিরে আসবে অন্ধকার থেকে আলোয় সেই ভুলে যাওয়া মুখ, হয়ত আনমনা হবে মন একটি মুহূর্তের জন্য, তারপরে কয়েকশ নীল হেরনকে একসাথে উড়ে যেতে দেখলে আমার মতই সব ভুলে সম্মোহিত হয়ে চেয়ে দেখবে প্রকৃতির রূপ।

কল্পনা ব্যানার্জী
আটলান্টা

তর্পণ III

তর্পণ I

পুরাতন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বর্ধিষ্ণু পরিবার মুখুজ্যে বাড়ির মাতৃহীন পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যম ভাই বিশ্বরঞ্জন ফুটবল খেলে,যাত্রা দেখে, গান গেয়ে দিন কাটাত। পড়াশুনা ও করতো। কিন্তু সে মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যেত। তাকে সংসারে বাঁধবার জন্য তার বাবামশাই নয় বৎসরের বালিকা ননীবালার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেন। সেই বালিকার সাধ্যও ছিলোনা তাকে সংসারে বেঁধে রাখার। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে বিবাগী হয়ে যায়। বহু দিন তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এক সময় সে ইংরেজ পুলিশের হাতে ধরা পরে এবং বিচারে তার দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

তর্পণ II

দশ বৎসরের কারাজীবনে বিশ্বরঞ্জনের জীবন এক নতুন দিকে মোড় নেয়। বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রাজবন্দীর মর্যাদার জন্য কারাগারে অনশন ধর্মঘট করে। অনেক রক্তের বিনিময়ে, বাইরের আন্দোলনের চাপে এবং সংবাদপত্রের জ্বালাময়ী লেখনীর কারণে ইংরেজ সরকার পিছু হটে। আন্দোলনকারীদের দাবি দাওয়া মেনে নেয়। দীর্ঘ দিন অনশনের ফলে বিশ্বরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পরে। তাকে ইংরেজ শাসকরাই সুস্থ করে তোলে। সুস্থ হয়ে বিশ্ব পড়াশুনাতে মন দেয়। সে কারাগারে পড়াশুনা করেই IA, BA পাশ করে। MA পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়। ইতি মধ্যে নয় বৎসর কেটে যায়। ন বছরের বালিকা ননী বালা - অষ্টাদশী তরুণী এখন, কালের নিয়মে। ভালো ব্যবহারের জন্য মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই বিশ্ব ছাড়া পেয়ে যায়।

তর্পণ III

পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মুখুজ্যে পরিবার বিখ্যাত তাদের বাড়ির নাট মন্দিরের জন্য। সে দেশ ভাগ হবার আগেকার কথা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে গ্রামের মানুষের, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের জমায়েত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সেদিনের আলোচনার বিষয় আসন্ন বাৎসরিক কালী পূজো। ইংরেজ শাসনের সুফল কুফল নিয়ে ও আলোচনা চলে। তবে সে আলোচনা হয় একটু নিম্ন স্বরে। ইংরেজদের চর কখন এসে পরে তার ঠিক নেই। বিশ্বরঞ্জনের জন্য এই বাড়ির উপর পুলিশের নজর একটু বেশিই আছে। মাঝেমঝেই তারা হানা দেয় আর কোনো রাজনীতির চাষ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য। বিশ্বর কারাবাসের সময় ইংরেজ পুলিশ একটু নিশ্চিন্ত ছিল। এখন বিশ্ব ছাড়া পেয়ে বাড়িতে আছে। তাই মাঝে মাঝেই পুলিশ দেখতে আসে বিশ্ব ইংরেজ বিরোধী কোনো কাজ করছে কিনা।

বিশ্ব তার MA পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। কয়েক দিন বাদেই সে পরীক্ষা দিতে কলকাতা যাবে। এই মুহূর্তে নাট মন্দিরে বয়স্কদের আলোচনার বিষয় আসন্ন বাৎসরিক কালী পূজো। মুখুজ্যে বাড়ি কালী পূজোর জন্য বিখ্যাত। পূজোয় মহিষ

বলি প্রথা এদের। পূজোর সময় নাট মন্দিরে কলকাতা থেকে যাত্রাদল আসে যাত্রা গান করতে। ঝুমুর নাচের দল আসে রাঢ় ভূমি থেকে। কলকাতা থেকে বিলিতি কারণ বারি আসে। সে এক এলাহী ব্যাপার। কালী পূজোর আগে পরে মিলিয়ে সাত দিনের উৎসব। কালী পূজোর সময়ে বড় করে লক্ষ্মী পূজো ও হয়। এত বড় জাকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য চার পাঁচ মাস আগে থেকেই তোরজোর শুরু হয় । গ্রামের লোকেরা ও দায়িত্ব ভাগ করে নেয় । তাই ঘন ঘন আলোচনা সভা হতে থাকে। চা,মুড়ি, চিঁড়ে ভাজা, নাড়ু যোগান আসতে থাকে ভিতর বাড়ি থেকে। সাথে রাজনীতির আলোচনা ও চলে নিম্ন স্বরে। এই সময় স্বাধীনতার আন্দোলন একটু স্তিমিত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র ঘটনা ঘটে। মাঝে মাঝে ইংরেজরা আক্রান্ত হয়। কোনো সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন তখন চলছিল না। কিন্তু বোঝা যায় চাপা একটা আক্রোশ ক্রমশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে দানা বাঁধছে। ইংরেজরাও বসে থাকেনি। ধর পাকর চলছিল ধরা পরে অপরিসীম অত্যাচারের স্বীকার হতে হচ্ছিল ভারতবাসী কে। বিশ্ব নাট মন্দিরে এসে দাঁড়ায়, সকলে তার দিকে বিস্ময় ও সম্ভ্রম মেশানো দৃষ্টিতে তাকায়। বিশ্ব এই বাড়ীর ছেলে কিন্তু চেহারায় ও ভঙ্গীতে যেন অন্যরকম। দীর্ঘ কারাবাসের জীবন তাকে অন্য সত্ত্বায় পরিণত করেছে। সে সবার সাথে কথা বলে, মেশে কিন্তু শিক্ষা, নির্জন বাস ও কারাগারের অভিজ্ঞতা তাকে অন্য মানুষ তৈরি করেছে। তার মুখ শান্ত কিন্তু দীপ্ত। তাকে দেখে মনে হয় তার মধ্যে একটা অগ্নি প্রবাহ আছে। সামান্য স্ফুলিঙ্গে তা দপ করে জ্বলে উঠতে পারে যেকোনো সময়ে।

শান্ত ভাবে বাবামশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব। বাবামশাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। সে বলে বাবামশাই, আমি কলকাতা যেতে চাই। আর মাসখানেকের মধ্যে আমার ফাইনাল পরীক্ষা। বাবামশাই আৎকে উঠে বলেন, সে কি? কলকাতা এখন অগ্নিগর্ভ। গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেবেন তার জন্য তোরজোর চলছে। সশস্ত্র আন্দোলন ও চলছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে। মাঝে মাঝেই ইংরেজ নিধনের খবর আসছে, তোমাকে এর মধ্যে কি ভাবে যেতে দিতে পারি? বিশ্ব বলে, আমার পক্ষে পরীক্ষা drop করা সম্ভব নয়। বাবা মশাই বলেন- তুমি এখন ঘরে যাও। আমি পরে তোমার সাথে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো।

বাৎসরিক কালী পূজোর আলোচনা সেরে তিনি ভেতর বাড়িতে আসেন। খুড়োমশাই, খুড়িমা, বিমাতা, বড়দা ধরণীধর ও অন্যান্য ভাইরা, জ্ঞাতি খুড়ো ও ভাইরা সকলেই বৈঠকখানা ঘরে আসেন মুখুজ্জে মশায়ের ডাকে। বিশ্বর কলকাতায় পরীক্ষা দিতে যাওয়া নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। পক্ষে বিপক্ষে সকলেই তাদের মত জানান। বেশির ভাগই না যাওয়ার পক্ষে রায় দেন বিশ্ব জানায় সে পরীক্ষা দেবেই, বলে- আমাকে কলকাতা যেতেই হবে। সকলে বিস্মিত ভাবে বিশ্বর দিকে তাকায় বড়দের মুখের উপর কথা বলার রীতি এ বাড়িতে নেই। বিশ্বর অন্তরে যে অগ্নি প্রবাহ সমাহিত হয়ে ছিল তার ঝলক তার কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সকলে বুঝতে পারে এই কথার আর নড়চড় হবে না। মুখুজ্জে মশাই অর্থাৎ বাবামশাই বলেন তাহলে মেজবৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমার একা যাওয়া হবেনা। বিশ্ব অবাক হয়ে বলে-পরীক্ষা দিতে যাবো আপনাদের মেজ বৌমা কে কি করে নিয়ে যাবো? আমার বাড়ি ঘর নেই ওখানে। ডাক্তারখুড়ো মশায়ের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেবো। বাবা মশাই বলেন-মেজ বৌমাকে নিতেই হবে। উনি তোমার সাথে থাকলে তোমার দায়িত্ব থাকবে ওর রক্ষনাবেক্ষনের। তুমি কোনো রকম আন্দোলনে জড়াবার আগে দু বার ভাববে এই অসহায় মেয়েটির কথা। এইটুকু বিশ্বাস তোমার উপরে রাখছি। ভবতোষের বাড়িতে তোমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে যত দিন ইচ্ছে। পরীক্ষার পর চাকুরী যোগাড় করে আলাদা বাসা করবে বৌমাকে নিয়ে। তোমার যা বিদ্যে ও বুদ্ধি একটা চাকুরী তুমি সহজেই পেয়ে যাবে। বিশ্ব বুঝতে পারে ননীবালা কে সঙ্গে না নিলে তার কলকাতা যাওয়া হবে না। অগত্যা সে রাজী হয় ননী বালা কে সঙ্গে নিতে যেতে।

পর দিন যাওয়া স্থির হয়। মুখুজ্যে মশাই পালকি স্থির করেন ননী বালার জন্য। বাড়ী থেকে ননী বালা পালকি করে গোয়ালনন্দ জাহাজ ঘাটায় আসে। বিয়ের পর এই প্রথম বার সে বাড়ির বাইরে বার হয়। বিশ্ব তার জিনিষ পত্র নিয়ে হেটে আসে। বিশ্ব ও ননীবালার পথে কোনো কথা হয় না। ননীবালা অজানা পথে অজানা স্থানে যেতে ভয়ে ও ভাবনায় কুঁকড়ে বসে থাকে। স্বামী সাথে আছে তবু তার মনে ভয়। স্বামীর সাথে সে এখন ও সহজ হয়নি। সামনে পরীক্ষা সে কারণেই হয়তো বিশ্ব সব সময় পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত ও নিজের মনেই থাকে। তখনকার দিনে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে কথা বলা শোভনও ছিল না।

স্টীমারে উঠে বিশ্ব ও ননীবালা পাশাপাশি বসে। বিশ্বর ননী বালার দিকে চোখ পড়ে ছোট্ট খাট্টো একটি মেয়ে মাথায় এক গলা ঘোমটা দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। বিশ্ব ননী বালার হাত ধরে দেখে হাত ঘামে ভেজা। বিশ্ব আলতো করে জিজ্ঞাসা করে, ক্ষিদে পেয়েছে খাবে? ননী বালা মাথা নেড়ে না জানায়। বিশ্ব এই কয়েক দিনে জেনেছে ননীবালা লাজুক এবং কখনো কিছু চাইতে জানেনা। বিশ্ব নিজেই টিফিন কৌটো খুলে খাবার বার করে নিজে নেয় ও ননীবালাকে দিয়ে বলে, খাও। ননীবালা ঘরের বাইরে অপরিচিত লোকের সামনে খেতে চায়না বিশ্ব গম্ভীর গলায় বলে, খেয়ে নাও। তোমাকে কেউ দেখছেনা। অগত্যা ননী বালা ঘোমটার তলায় সসঙ্কোচে খাবার খায়। বিশ্ব টিফিন খেয়ে, কৌটো ধুয়ে গুছিয়ে রাখে। বিশ্বর কাজকর্ম দেখে ননী বালার অবাক লাগে। সে কখনও পুরুষ মানুষদের এই ধরণের কাজ করতে দেখেনি। বিশ্বর ব্যক্তিত্বের সামনে কিছু বলতে ও সাহস পায় না। বিশ্ব ননী বালার হাত ধরে, দেখে ননী বালা কাঁপছে, স্নেহ ভরে বলে, ভয় পেয়েছো? ভয় কি! আমি তো আছি। স্ত্রীকে অভয় দান করে সে পড়ায় মন দেয়। এক ফাঁকে ননীবালাকে জিজ্ঞাসা করে লিখতে পড়তে পারো? সে ঘাড় নেড়ে না জানায়।

এত দিন সময় পেলে পড়লে না কেন? ননীবালা চুপ। পড়তে ইচ্ছে করে না? ননী বালা নিরুত্তর।
বিশ্ব ননীবালার হাতে চাপ দেয় তোমার পড়তে ইচ্ছে করেনা?
এবার ননী বালা অস্ফুটে বলে, কে পড়াবে?
বিশ্ব অবাক হয়ে বলে, বাড়িতে এত লোক! তোমার বয়সী আমার ভাইরা তো ছিল। ওরা যখন পড়তো তুমি কেন ওদের সাথে পড়লে না?
খুড়িমার সাথে থাকতাম। খুড়িমা যা বলতেন তাই করতাম। পড়তে বলেন নি।
ঠিক আছে । আমার পরীক্ষার পর তোমাকে আমি পড়াব। সে আরো বলে, মাথায় এত ধ্যাবড়া করে সিঁদুর দেবে না। আমার বিচ্ছিরি লাগে।
ননী বালা চমকে যায় বলে সিঁদুর পড়বো না?
না পড়বে না। পড়লেও খুব কম।
বিশ্বর কথায় ননীবালা বিস্মিত সধবা মেয়ে মাথায় সিঁদুর দেবেনা? তার অবাক হওয়ার আরো বাকি ছিল, বিশ্ব ননীবালার মাথার ঘোমটা টেনে নামিয়ে দিয়ে বলে, এত বড় ঘোমটার কি দরকার? ননীবালা বিস্ফারিত নেত্রে বিশ্বর দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে এই কথার কোনো নড়চড় হবে না। ও মাথায় ঘোমটা দেবার আর চেষ্টা করেনা। মাথা নিচু করে বসে থাকে। বিশ্ব ননীবালার হাত শক্ত করে ধরে রাখে। বিশ্ব তখনকার সমাজ ও সমাজজীবন সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। দীর্ঘদিন সে কারাগারে বন্দী ছিল। তার মানসিক বিকাশের সময় সঙ্গী ছিল বই। ফলে তখনকার সামাজিক সংস্কার বা কুসংস্কার তার জানা ছিল না। চিন্তা ও ভাবনায় সে ছিলো সময়ের আগে।

বনগাঁ থেকে দুপুরে বিশ্বরা কলকাতা যাবার ট্রেন ধরে। ট্রেনে উঠে বিশ্ব পড়ার বই যত্ন করে গুছিয়ে রাখে। ননী বালার সাথে ওর গল্প করতে ইচ্ছে করে। জেল জীবনের নানা গল্প, দেশ কি, দেশের স্বাধীনতার জন্য কি ভাবে মানুষ তাদের জীবন

বাজি রেখে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। ও সব উজাড় করে ননীবালা কে বলে। এই প্রথম বিশ্ব কারুকে তার নিজের ভাবনার কথা বলে-বলতে তার খুব ভালো লাগে। অবাকও হয়। ও ভাবে, একেই কি জীবন সঙ্গিনী বলে। তার পঁচিশ বছরের জীবনে সে কারুর সাথে এত কথা বলে নি। ননীবালা তার একান্ত আপন এই ভাবনায় তার মনে এক ধরণের সুখ অনুভূত হয়। ননীবালার সাথে গল্প করে বিশ্বর ভালো লাগে। ননীবালার মনে হয় ও যেন রূপকথা শুনছে। কোনো এক রাক্ষস যেন এক সুন্দরী মেয়েকে বন্দী করে রেখেছে। তাকে বন্ধন মুক্ত করার জন্য রাজপুত্ররা জীবন পণ করে যুদ্ধ করছে। সে ভাবে এই সুন্দরী মেয়েই কি দেশ! বিশ্ব যাকে মা বলছে। এই মা কি ফরিদপুরের দেভোগ গ্রামের মত সুন্দর না তার চাইতে ও সুন্দর! ননীবালার আঠারো বছরের জীবনে ঝড় ওঠে। স্বামীর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকে। স্বামীকে তার মনে হয় যোদ্ধা রাজপুত্র, যে তার সুন্দরী মা কে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করে, নবছর জেলে ছিল সবাইকে ছেড়ে। হঠাৎ তার ভয় করতে থাকে এই ভেবে যদি স্বামী আবার যুদ্ধে চলে যায়। তাহলে তার কি হবে? অজানা দেশে তাকে কে দেখবে। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে তার শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। বিশ্ব তার কান্না দেখে অবাক হয়ে বলে, কি হলো? কাঁদছো কেন? ননীবালা অঝোর ধারে কেঁদেই চলে। দীর্ঘ নবছরের দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, বেদনা, জমানো কান্না চোখের জল হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। বিশ্ব ননীবালা কে কাঁদতে দেয়, বুঝতে পারে এই কান্না একটা অসহায় মেয়ের দীর্ঘ নবছরের সঞ্চিত বেদনা। বিশ্ব ননীবালার হাত শক্ত করে ধরে রাখে। যেন বলতে চায় আমি আছি ।

ট্রেন চলতে থাকে দু পাশের সবুজ বনানী বাড়ি ঘর কে পাশে পাশে নিয়ে গন্ত্যব্যে। সন্ধ্যার পর ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায়। বিশ্ব ও ননীবালা প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসে। এক সঙ্গে এত লোক ননীবালা কখন দেখেনি সে নিজের অজান্তেই বিশ্বর হাত চেপে ধরে। ডাক্তার খুড়োমশাই গাড়ী নিয়ে স্টেশনে আসেন ওদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাদুড়বাগানে তার বাড়ী। সাদরে ননীবালাকে তিনি তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। বিশ্বর সাথে তার জেলে থাকাকালীন নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এই বৌমাকে তিনি দেখেন নি। তাই ননীবালাকে তারা রীতিমতো বরণ করে ঘরে তোলেন। ননী বালা এত আদর ভালোবাসা তার আঠারো বছরের জীবনে খুব একটা পায়নি। এক দেশের বাড়ীর খুড়িমা ছাড়া। ননীবালা আপ্লুত হয়ে পড়ে । ডাক্তার খুড়োমশাই বিশ্বর পরীক্ষার ব্যাপারে জানতে চান। বিশ্ব জানায় সে পরদিন সকালে এডমিট কার্ড আনতে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। সেখানে যদি না পাওয়া যায় তবে প্রেসিডেন্সি জেলে যাবে। আগে বন্দীদের পরীক্ষার এডমিট কার্ড জেলেই পাঠাত ওরা। কথায় কথায় খুড়িমা জানান বোন অন্নপূর্ণার বিয়ে ঠিক হয়েছে খুব বড় ঘরে। প্রথম কংগ্রেস সভাপতি W.C. Banerjee র বাড়ীতে। বিশ্ব খুব খুশি হয় শুনে। অন্নপূর্ণা তার প্রিয় বোন। জেলে বিশ্বর সাথে দেখা করতে যেত। খুড়িমা বলেন-অনুর বিয়েতে তোমাকে থাকতে হবে, খাটাখাটনি করতে হবে। এখনই তোমরা বাসাবাড়িতে চলে যেওনা। তোমার কোনো চাকুরী না হওয়া পর্য্যন্ত এখানেই থাকবে। মেজবৌমা একটু সরগর হলে তবে যাবে। নানারকম কথাবার্তার মধ্যে রাত হয়। তারপর সবাই শুতে যায়। বিশ্ব পড়তে বসে। এক সপ্তাহ বাদে তার পরীক্ষা।

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে বিশ্ব এডমিট কার্ড আনতে বেরোয়, খুড়ো মশাই সাবধান করেন বিশ্ব কে বলেন- খুব বোমা পড়ছে শহরে। কলকাতা উত্তপ্ত হয়ে আছে। গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইংরেজ শাসকও বসে নেই, অল্প বয়সী ছেলেদের দেখলেই সন্দেহের বশে জেলে পুড়ছে। জেলে অত্যাচার ও হচ্ছে মাত্রা ছাড়া। ইংরেজ শাসকের মাত্রা ছাড়া নৃশংস অত্যাচারে অতিষ্ঠ যুব সমাজ। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অস্ত্র দিয়ে ইংরেজ তাড়াবার শপথ নিয়েছে। অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ, বোমা নিক্ষেপ চলছেই - যাতে ইংরেজ ভয় পেয়ে এ দেশ ছাড়ে। তুমি সাবধানে যাবে । আর খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরবে। আমি তোমাকে গাড়িতে নিয়ে যেতে পারি ।

বিশ্ব তাড়াতাড়ি বলে ওঠে - নানা। আমি সাবধানে যাবো। আপনাকে সময় মতো চেম্বারে বেরোতে হবে। রুগীরা আপনার আশায় বসে থাকবে। তাছাড়া আমার এডমিট কার্ড কোথা থেকে পাবো তাই তো জানিনা। আমার দেরি হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বিশ্বর আপত্তিতে অগত্যা খুড়ো মশাই ক্ষান্ত হলেন। বিশ্ব বেরোবার আগে ননী বালার সাথে দেখা করে অভয় দিয়ে বলে-আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। তুমি চিন্তা করোনা। ননী বালার শান্ত বড় বড় চোখে আশঙ্কার ছায়া। বিশ্ব ননী বালার মাথায় হাত রেখে বলে-ভয় নেই।

সন্ধ্যে যায় রাত্রি আসে। বিশ্ব কিন্তু ফেরে না। দীর্ঘদিন তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক ছোটাছুটি খোঁজ খবর করার পর জানা যায় তাকে আন্দামানে গুরুতর অভিযোগে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। সেই দিন রাজাবাজারে ঘনঘন বোমা পড়েছিল ইংরেজদের গাড়িতে। দুজন ইংরেজ নিহত ও কিছু আহত হয়। ফেরার পথে বিশ্ব সেই গন্ডগোলে পড়ে। তার বিরুদ্ধে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ছাপ আছে। তাই ছাড়া পাওয়ার কোনো পথই নেই। মুক্তির আশা সাগরের জলে ভেসে যায় । ননীবালা ডাক্তার খুড়োমশায়ের সাথে ফরিদপুরের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসে এক সময়।

আবার শুরু হয় তার অন্তহীন প্রতিক্ষার পালা।

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেল

সেলিন্‌থিপের দেশে

লেখা ও ছবি - সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

ব্যাঙ্কক শহরটা বিশাল বড়। কিন্তু ঠিক কলকাতার মতো না। কলকাতার মানচিত্র, আমার করা ডিমের পোচের মত দেখতে। ছেতরে যাওয়া, একদিকটা লম্বাটে, কিছুটা যেন ছিঁড়ে আসছে, কুসুমটা গলে গড়িয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাঙ্কক অনেকটা ওস্তাদের হাতে তৈরি ডিমের পোচ (আসলে এটাই ফ্রায়েড এগ। আমাদের ডিম ভাজা হলো অমলেট, আর পোচড্ এগটা তৈরি হয় ফুটন্ত জলে ডিম ভেঙে ছেড়ে দিয়ে)। প্রায় গোলাকার, আর মাঝামাঝি হলো তার ধর্মতলা বা ডাউনটাউন। বেশিরভাগ শহরেই ধর্মতলা থাকে শহরের কেন্দ্রে, বাত্যয় নিউ-ইয়র্ক। ওঁয়াদের ইয়েটা হলো শহরের এক প্রান্তে, সমুদ্দুরের ধারে। ওই যে, যেখানে পেল্লায় উঁচু দুটো বাড়িতে প্লেন দিয়ে ধাক্কা মেরে.....। কলকাতা থেকে দু ঘন্টা উড়ে যেখানে নেমেছি, সেটা আদতে ব্যঙ্ককের বিখ্যাত সুবর্নভূমি বিমানবন্দর নয়। শুনেছি সেটা নাকি অ্যায়সা ঝাঁ-চকচকে, যে দেখে আপনার মাথা ঘুরে যাবেই। আর ব্রহ্মতালুর সেই ঘূর্ণীতে যাতে আপনি ধাঁই করে পড়ে মুন্ডু না ফাটান, তাই নাকি সেই বিমানবন্দর আদ্যপান্ত নরম কার্পেটে মোড়া। পড়ে গেলেও লাগবেনা। আর দোকানপাট? আমাদের নিউমার্কেট – সাউথ সিটি – মনি স্কোয়ার - অবনি নাকি তার কাছে তুচ্ছ। দেখলেই চোখ টেরিয়ে যায়। আর চোখের সেই ট্যারা ভাব ঠিক করার জন্যে নাকি বিমানবন্দরের সব দোকানের শো-উইন্ডোর শার্সিতে পাওয়ার দেওয়া আছে। সুবর্নভূমির বর্ননা দিয়েছিলেন বন্ধুবর স্বনামধন্য সেন মহাশয়। ব্যাটা একে বেঁটে, তায় বদ্যি তার ওপর আবার হুইপারের, কাজেই সে বর্ননা আপনি পড়বেন কিনা, আর পড়লেও গিলবেন কিনা, সে ভার আপনার ওপরেই ছাড়লাম। কারন আমি সুবর্নভুমি দেখিনি। আমরা যেখানে নেমেছি, সেই বিমান বন্দরে শুধু আসে এয়ার এশিয়ার বিমান। এ হলো কিঞ্চিত সস্তার এয়ারলাইন। কলকাতা থেকে ছাড়ে রাত একটার সময়, আর দু ঘন্টা পরে নেমে পড়ে ব্যাঙ্ককে। সেখানকার সময় অনুযায়ি তখন সূয্যি উঠি উঠি করছে। তা ওই মাঝরাতের উড়ানে খাবোই বা কি? ও তো আমাদের ঘুমের সময়। কাজেই খাদ্য পানীয় নাই বা দিলো? কেবল আমার কন্যারত্নের জন্যে এক বোতল জল এনেছি। আমাদের মধ্যে তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। জীবনে প্রথম বার আকাশে ওড়ার টেনশনে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একবার রাস্তায় বমি করেছে, তারপর দমদম বিমানবন্দর দেখে খুশিতে প্লেনে ওঠার আগে ঘন্টা তিনেক দৌড়োদৌড়ি করেছে। আমি প্লেনে উঠে লাল স্কার্ট পরা বিমানসেবিকাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বিমানে বাথরুম আছে কিনা। কে জানে বাবা, খেতে দেবেনা বলে যদি ইয়ে করতে না দেয়? উত্তরে সাড়ে-বত্রিশ পাটি (আধখানা আক্কেল দাঁতও ছিলো) উজাড় করা একটা কিছু পেলাম। সেটা হাসি, না দাঁত খিঁচুনি, ঠিক বলতে পারবো না।

ডন মুয়াং হলো ব্যাঙ্ককের পুরোনো বিমানবন্দর। সুবর্নভূমি তৈরি হবার পর এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু দু বছর পরে, লোকের ভিড় সামলাতে, আর সুবর্নভূমির ওপর চাপ কমাতে এটা আবার খুলে দেওয়া হয়। এখন এখানে এয়ার এশিয়া সমেত কিছু সস্তার বিমান ওঠানামা করে। আমরা নেমেছি স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে চারটেয়। সে সময় মানুষ তো কোন ছার, বাড়ি-ঘরদোরও ঘুমোয়। ইমিগ্রেশনে কোন লাইন নেই। কাউন্টারের পেছনে নীলচে-কালো ইউনিফর্ম পরিহিতা আধঘুমন্ত থাই কন্যা আমাকে ভিসার ফর্ম গুলো দিলেন। সেখানে অন্য সব কিছুর সঙ্গে লিখতে হবে আমরা এ দেশে কোথায় থাকবো। আমি টিকিট কেটেছি আসবার মাত্র কয়েক দিন আগে। আগে থেকে ভিসা ও করাইনি। আমাদের ভিসা নেই। শুনেছি এখানে নাকি পনেরো দিনের কম থাকলে বিমানবন্দরে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ভিসা দিয়ে দেয় ভারতীয়দের। এদিকে কোথায় থাকব তার ঠিকানা জানিনা। ইতি-উতি তাকিয়ে দেখি নানান বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে বিভিন্ন হোটেল আর রিসোর্টের। ফর্ম ভরবার অছিলায় কাউন্টার থেকে একটু সরে এলাম। বিজ্ঞাপনের একটা হোটেলের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর টুকে দিয়ে ফর্ম জমা দিলাম, সঙ্গে

পাসপোর্ট আর ফেরার টিকিট আর আমাদের সকলের ছবি। কাউন্টারের ভেতরে ঘপাত ঘপাত করে কয়েক প্রস্থ ছাপ্পা মেরে পাসপোর্ট গুলো আমার হাতে ফিরে এলো। থাইল্যান্ডে ঢোকার ছাড়পত্র সমেত। সব মিলিয়ে সময় লাগলো মিনিট পাঁচেক।

এয়ারপোর্টের ঠিক বাইরেই দেখি বাসস্টপ। সেখানে আবার বসার জন্য চেয়ার পাতা। সেখানে বসেই আমরা বাসের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বড় বড় শহরে দেখেছি রাস্তা, রাস্তার ওপর ফ্লাইওভার, তার ওপরে আরো ফ্লাইওভার। এত গোলকধাঁধায় আমি ধাঁধিয়ে যাই। বুঝতে পারিনা, কোন দিকে চলেছি, কতদুর এলাম। এখানেও তাই হলো। একটু পরেই সব গুলিয়ে গুবলেট। একটা ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে চলেছি। খালি ভাবছি এবারে মাটিতে নামবে বুঝি। কিন্তু নক্ষত্রবেগে মিনিট কুড়ি ধরে ওই ভাবে চলার পরেও যখন আমাদের মিনি বাস মাটি ছুঁলোনা, তখন এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম আর কতক্ষন এই ফ্লাইওভার চলবে? হাসি হাসি মুখে সে উত্তর দিলো – "ইয়েস, ইয়েস, ফ্লাইওভার"। বড় নিশ্চিন্ত লাগলো, আমার অতুলনীয় ইংরেজি জ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয় কাউকে পেয়ে। পরের কদিনে বার বার এরকম নিশ্চিন্ত লেগেছে, শুধু একদম শেষের বার ছাড়া। সে গপ্পে আসবো পরে। গাড়ির একটা আসনে আমার কন্যরত্ন ঘুমে কাদা। বেচারার এখন মাঝরাত, দেশের হিসেবে। আর তার আগের সিটে বসে তার মা ও দেখলাম নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। প্রায় আধঘন্টা পরে ফ্লাইওভার থেকে নামলাম। পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ফ্লাইওভারটা নাকি সাতান্ন কিলোমিটার লম্বা। ভেবে দেখুন, দমদম থেকে সাতান্ন কিলোমিটার একখানা ফ্লাইওভার যদি থাকতো, কল্যানী কি কোনা ছাড়িয়ে কাঁহা কাঁহা মুলুকে পৌঁছে যাওয়া যেত মাটিতে না নেমে। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি চললো মাঠঘাটের ভেতর দিয়ে। দিব্যি চওড়া রাস্তা, আমাদের দুর্গাপূর এক্সপ্রেসওয়ের প্রায় দ্বিগুন চওড়া, আর আরো মসৃন। দু দিকে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত। বর্ষার শেষ বলে মাঠে কর্মরত মানুষের সংখ্যা খুব কম। কোথাও কোথাও টোকা মাথায় দু একজন কৃষক মাঠে কাজ করছে। মাঝে মাঝে বেশ বড় বড় কারখানা। সাদা সাদা বাড়ি, হালকা নীল ছাদ তাদের। ভাগ্যিস এখানে চাষ জমি রক্ষার আন্দোলন...।

আগে নাম ছিলো থাপ ফ্রায়া। অর্থাৎ কিনা ফ্রায়ার সেনা বাহিনী। ফ্রায়া ছিলেন শ্যাম দেশের রাজা। সে সময় দেশের রাজধানী ছিলো আয়ুত্থায়া। শ্যামদেশ তথা আজকের থাইল্যান্ডে যেখানেই যান, রামায়ণের প্রভাব আপনার চোখ এড়াবেনা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের আদীকবি বাল্মিকির রামায়ন। সে প্রভাব এমনই গভীর, যে ওনারা নিজেদের রাজধানীর নাম রাখলেন অযোধ্যা। একবার ভাবুন দিকি, ইউপির "আওয়াধ" থেকে এসে চিত্তরঞ্জন পেরোতেই আপ কান্ট্রির "আইয়োধ্যা" হয়ে গেলো বাংলা "অযোধ্যা"। তাহলে এতখানি সমুদ্দুর পেরিয়ে সুদুর শ্যাম দেশে গিয়ে সে "আয়ুত্থায়া" হলে তাকে চিনবোনা কেন? এ দেশের রাজার নাম রাম। ঠিক নাম নয়, বরং বলা ভালো উপাধি। যিনিই যান আয়ুত্থায়া, তিনিই হন রাম। আগের রাজধানি আয়ুত্থায়া, এখন অবশ্য ব্যাঙ্কক। সব রাজারই উপাধি রাম। এখনকার রাজা ভূমিবল অদুল্যদেজ হলেন দশম রাম। মহারাজের নামটা লক্ষ্য করুন। আদতে ভূমিবল অতূল্য তেজ। পশ্চিম বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন অতূল্য ঘোষ। অতুল্য নামটা আমাদের চেনা। হিন্দুস্থানি "আতুল" নয়, বাংলা "অতুল্য"। ঠিক একই ভাবে, থাই কথা আর নামের মধ্যে অনেক চেনা শব্দ পাবেন। অভ্যর্থনার সময় থাইরা একটু ঝুঁকে হাত জোড় করে যেটা বলেন, সেটা শুনে প্রথমে ঠাওর হয় – "সদি খা"। এই সদি আসলে "স্বস্দি" বা স্বস্তি। আমরাও বহু আগে শুভ-মস্তু বা স্বস্তি-মস্তু বলতে অভ্যস্ত ছিলাম। পরে শান্তি আর স্বস্তি হারিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে অভ্যাসও। এখন শুধু শান্তির জল ছিটনোর সময় ঠাকুরমশায়রা "ওঁ স্বস্তি" বলেন। এই যে ব্যাঙ্কক থেকে বেরিয়ে যে প্রদেশের মধ্যে দিয়ে এলাম, তার নাম চোনবুরি। ব্যাঙ্ককের উত্তরে আবার আছে কাঞ্চনাবুরি। বুরি আসলে পুরি। কাঞ্চনপুরি আর

স্বর্ণপুরি হয়ে গেছে কাঞ্চনাবুরি আর চোনবুরি। যাই হোক, তো সেই রাজা ফ্রায়া তাঁর সেনা নিয়ে দক্ষিন দিকে এই চোনবুরি রাজ্যের ভেতর হানা দিলেন। সে সময় এই এলাকার রাজা , ফ্রায়ার সুশিক্ষিত সেনা দেখে এতই অভিভুত হয়েছিলেন যে যুদ্ধ না করে, অধীনতা মেনে, ফ্রায়ার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই থেকে ওই জায়গার নাম হয় থাপ ফ্রায়া, বা ফ্রায়ার সেনা বাহিনী । বিংশ শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত থাইল্যান্ড উপসাগরের তীরবর্তি এই সুন্দর ছোট্ট জনপদের নাম তাই ই ছিলো। কিন্তু ততদিনে পাশের দেশ ভিয়েতনামে জোর লড়াই বেঁধেছে। লম্বা চওড়া গোলাপী গালের মার্কিনী বীরদের লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে এট্টু আমোদ-প্রমোদেরও দরকার হয়। পূর্বতন ফরাসি ইন্দোচিনের, তথা তৎকালীন দক্ষিন ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনের আবার এদিকে ছিলো বিস্তর খ্যাতি। কিন্তু বিধি বাম। ভিয়েতনামের ক্ষয়াটে চেহারার চাষাভূষো লাল গনফৌজ চোয়াল শক্ত করে, মার্কিনী পল্টনকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিলো। সাধের সায়গন ছেড়ে গেলেন প্রভুরা এয়ার আমেরিকা চড়ে। এই নামে একটা ছবিও হয়েছে হলিউডে। দেখতে পারেন স্পিলবার্গের "দ্য পোস্ট", সিআইএর নির্লজ্য আগ্রাসন এবং বানিজ্য করার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী কুকীর্তির জাল বিছোনোর পদ্ধতি। কিন্তু ভিয়েতনামের গনফৌজ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সায়গনকে মুক্ত করার পরে, মার্কিন জলপাই উর্দির, জলকেলীর জন্য জল পাই কোথায়? চোখ পড়লো থাপ ফ্রায়ার দিকে। সেদিনের থাপ ফ্রায়া হয়ে গেলো আজকের পাট্টায়া। ইন্দোচিনের লাস ভেগাস। এখানে কি না হয়? আর যা হয়, তা এখানেই থাকে। বাইরে যায় না।

সকালে জলখাবারটা বেশ বেশিই হয়ে গেলো। আমার আবার বাইরে গেলে খিদেটা একটু অতিরিক্ত পায়। তবে কিনা দেখলাম আমার এক টুকরো পাউরুটি খাওয়া মেয়ে আর তার মা, দু তিন বার করে প্লেট ভরে ভরে খাবার নিয়ে এলো। সুইমিং পুলের পাশে , ছাতার তলায় বসে ব্রেকফাস্ট খেতে দিব্যি লাগছিলো। মেয়েকে দেখে বুঝলাম, সামান্য একটু পরিবেশের তফাত একটা মানুষ কে কি ভাবে বদলে দিতে পারে। যে মেয়ে বাড়িতে কোনো দিন একটুকরো ফল মুখে দিতে চায়নি, সে দেখলাম দু গ্লাস ফলের রস খেয়ে ফেললো। আরো ফলের দিকে নজর ছিলো, কিন্তু এক যাত্রায় অতিরিক্ত ফলাফল ভালো নয়, তাই বারন করলাম। এদিকে ঘড়িতে প্রায় সকাল সাড়ে দশটা বাজে। তাই দুপুর বেলা খাবার পরিকল্পনাটা একটু পালটে নিলাম। বাইরে একটা সেভেন ইলেভেন স্টোরে খাবার জল কেনার সময় খোঁজ নিয়ে পরিকল্পনা করলাম কাছেই একটা গ্রামে এখানের কিছু প্রথাগত নাচের অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিছু অঞ্চলে দেখেছি শহুরে "বাবু" রা "জঙ্গলে" বেড়াতে গিয়ে "আদিবাসী" দের লাচ দেখেন সন্ধ্যে বেলা হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে। হয়ত ছোটবেলায় শহুরে পরিবেশে মানুষ হইনি বলেই, এরকম ভাবে নাচ দেখতে মনের ভেতরে কোথাও একটা আটকায়। কিন্তু যখন নিজেদের উৎসবের সময় সাঁওতাল মেয়েরা লালপেড়ে শাড়ি পরে নাচতে থাকে, সেখানে খুব খোলা মনে তাদের নাচ উপভোগ করতে পারি। এখানে নাচ হবে বিকেল বেলা, আর মঞ্চের ওপর। সেখানে পান ভোজনের কোনরকম ব্যবস্থা নেই। যদি থাই সংস্কৃতিতে আপনার কৌতুহল থাকে, তাহলে আসুন, দেখুন আর উপভোগ করুন। নাহলে স্বচ্ছন্দে বাদ দিন আপনার ভ্রমনের তালিকা থেকে। আমার এই থাই নাচ দেখার উৎসাহ ছিলো অনেক দিন ধরে। আগে কিছু ছবি দেখেছি এই নাচের, কিন্তু চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ফোন করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করলাম। ড্রাইভার ছেলেটির মুখে হাসি মিলিয়ে যেতে দেখিনি। খুব ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজি বলে। আমারই মতো। আকারে-ইঙ্গিতে কাজ চালিয়ে নিলাম। যেতে হবে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। হোটেল থেকে বেরিয়ে ঘিঞ্জি রাস্তা। ইতি উতি খাবারের দোকান, কোনোটা থাই, কোনোটা চিনে, ইতালিয়ান বা রাশিয়ান ও রয়েছে। আর রয়েছে যথেস্ট সংখ্যায় ভারতীয় খাবারের দোকান, বেশিরভাগ পাঞ্জাবীদের, আর ঢাবা বলে লেখা আছে। এখানে বলে রাখি, দেশের বাইরে নেহাত ঠেকায় না পড়লে ভারতীয় খাবারের দোকান এড়িয়ে চলাই ভালো। এটা বলছিনা যে সব জায়গাই বাজে, তবে কিনা

শতকরা নব্বইভাগ ভারতীয় রেস্তোরাঁ আপনাকে যাহারপরনাই নিরাশ করবে। পাট্টায়া শহর ছাড়িয়ে গাড়ি হাইওয়ে ধরলো। মসৃন গতিতে প্রায় ঘন্টায় ১২৫ কিলোমিটার বেগে পঁয়তাল্লিস মিনিটে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। নেমে দেখি লোকে লোকারন্য। সাদা, কালো বাদামী, হলদে সব রকমের সব দেশের মানুষ এসে জুটেছে সেখানে। খালি দেখবেন না দেশী, অর্থাৎ ভারতীয়-পাকিস্তানি-বাংলাদেশী মানুষ। কান পাতলেই শুনছি "স্পাসিবো", "নিয়েৎ" কিম্বা "পাংলুশকি দা?", প্রচুর রুশি। আর তারা এসেছে আন্ডা-বাচ্চা-ভাই-ভাতিজা-বাপ-পিতেমো সমেত। চুষিকাঠি মুখে কয়েক মাসের লালচে রাশিয়ান ছানা থেকে সাদা কাগজের মত গায়ের রঙ, তলস্তয়ের মত দেখতে টাকমাথা, দাড়িওয়ালা খাঁটি রুশি দাদু, সবাই আছেন দলে। আর দেখলাম দলে দলে চিনে ট্যুরিস্ট। ভাষা বাবদ তাদের আবার আরো খারাপ অবস্থা। চিনে ছাড়া কোন ভাষা জানেনা। একে অন্যের হাত বা জামা ধরে আছে। আর দলের সামনে গাইড একটা রঙ্গিন পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হারিয়ে গেলে, ওই পতাকা দেখে চিনতে পারবে। আছেন আমেরিকান ট্যুরিস্ট, আছেন জাপানিরা। চিনে আর জাপানি দেখে আলাদা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কথা বললে তবু কিছুটা বোঝা যায়। আর দেখলাম কিছু পশ্চিম এশিয়ার লোকজন। সঙ্গে বোরখা পরে মহিলারা।

চত্তরে কিছু হাতি ঘুরছে। তাদের পিঠে ভারি সুন্দর কারুকাজ করা হাওদা। দেখলাম একটা সিঁড়ি আর মঞ্চ। একটা করে হাতি এসে দাঁড়াচ্ছে সেখানে আর সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠছে হাতির পিঠে। চত্তরে একপাক ঘুরে এসে আবার ওইখানেই সওয়ারি নামিয়ে দিচ্ছে হাতি। মেয়ের মা দেখলাম চকচকে চোখে দেখছে হাতির দিকে। নির্ঘাত চড়ার সখ হয়েছে। মধ্যতিরিশে মেয়েদের মধ্যে ছেলেমানুষী কমে আসে বটে, কিন্তু একেবারে যায়না। কিন্তু বাধ সাধলো মায়ের মেয়ে। আমার মেয়ে আমার মতোই। রাম ভিতু গোছের। অতবড় জানোয়ার দেখে পুঁচকি বেচারা গেলো ঘাবড়ে। কিছুতেই রাজি হলো না উঠতে। হস্তিবিহারের সেখানেই ইতি ঘটলো। পা বাড়ালাম আরো ভেতরের দিকে। দেখলাম একজায়গায় গোল করে ঘেরা, আর তার চারিদিকে বসার জন্যে বেঞ্চি পাতা আছে। আমরা গিয়ে মাঝামাঝি একটা ভালো জায়গা বেছে বসলাম। মঞ্চের আয়োজন খুব সাধারন, জাঁকজমক নেই তেমন। ধিরে ধিরে নর্তক নর্তকিরা মঞ্চে উঠে এলেন। ঢাকের বাজনা শুরু হলো, সেই সঙ্গে তারের যন্ত্রের বাজনা। অনেকটা চিনে বাজনার মত, তবে সুর ও তাল একেবারেই আলাদা। ঠিক নাচ না বলে, নৃত্যনাট্য বলা ভালো। বিষ্ণুর অবতার রাম, তাঁর ও সীতার বিয়ে, বনবাস, রাবন, রাক্ষস, হনুমান, শূর্পনখা, যুদ্ধ, সবই ছিলো, এমনকি একটা জায়গায় অকাল বোধন পর্য্যন্ত দেখলাম মনে হলো। কি অপূর্ব আর রঙিন পোষাক কুশীলবদের। আর তেমনই সুন্দর তাঁদের নাচের ভঙ্গি।

নাচের মুদ্রা কিছুটা যেন আমাদের মনিপুরি নাচের সঙ্গে মেলে। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। যাঁরা নৃত্যনাট্যে সরাসরি অংশ নিলেন, তাঁরা তো মঞ্চে ছিলেনই, কিন্তু উপরি পাওনা হলো মঞ্চের ওপর বাজনদারদের উপস্থিতি। আমাদের গ্রামের যাত্রাপালায় বাজনদাররা বসেন মঞ্চের একপাশে, এখানেও তেমনই। শুধু দেখলাম, এখানে বাজনদাররা বসে নেই। দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছেন, আর শুধু দাঁড়িয়েই নয়, বাজনার গমকের তাকে তালে লাফিয়ে উঠছেন বাজাতে বাজাতে। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম প্রানশক্তি আর উচ্ছলতা। থাইল্যান্ড হঠাৎ করে বড্ড ভালো লেগে গেলো। ছুটকিটা আমার পাশে বসে বসে পুরোটা দেখলো আর দেখলাম খুব জমে গিয়ে উপভোগ করলো। সংস্কৃতি ভিন্ন করে মানুষকে, আবার জুড়েও দেয়। নাচের প্রানশক্তি আর উচ্ছলতা এখানে মুগ্ধ করলো বটে, কিন্তু

নাচের অনুষ্ঠানের পরে তার আরো এক রূপ দেখলাম। দেখলাম ঠিক বক্সিং এর মতো দেখতে রিং, আর তার দু ধারে নেমে পড়লেন বক্সিং এর দস্তানা পরে দু জন থাই বক্সার। এর নাম মুয়ে থাই, আদতে থাই মার্শাল আর্ট। জাপানিদের যেমন জুদো, চিনে দের কুং ফু, কোরিয়ান দের তাইকোনদো, ঠিক সেরকমই থাই দের রয়েছে মুয়ে থাই। আমদের কাছে মুয়ে থাই পরিচিত কিক্ বক্সিং নামে। অর্থাৎ হাত দিয়ে ঘুষোঘুষি তো চলেই, পা দিয়ে লাথালাথি ও চলে সেই সঙ্গে, যেটা বক্সিং এ চলেনা। লড়াই শুরু হবার পর হাত আর পা সমান তালে চললো। আগে টিভি তে বা সিনেমায় কয়েকবার দেখেছি বটে কিক্ বক্সিং, কিন্তু সামনে বসে দেখতে গিয়ে প্রতিটি ঘুষি আর লাথির শব্দে গা সিরসির করছিলো। তিন রাউন্ড লড়াই হলো, আর শেষে একজন ধরাশায়ী ও হলো। কিন্তু সত্যি বলছি, খেলাটা খুব একটা উপভোগ করতে পারিনি। মেয়ে তো একটু ভয়ই পেয়ে গেলো। আর তাছাড়া সারা রাত বিমান যাত্রা। তার পরে ২৫০ কিলোমিটার গাড়িতে। দুপুর বেলায় এখানে লম্ফঝম্ফ। দেখলাম মা মেয়ে দুজনেই নেতিয়ে পড়েছে। ফিরলাম হোটেলে। ওরা দুজনে ঘুমিয়ে নিলো খুব খানিকটা। কেউ ঘুমোলে কেন জানি আমার খুব মায়া লাগে। কেমন নিশ্চিন্ত মুখে ঘুমোই আমরা। ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যে বেলা দেখলাম মা মেয়ে চাঙ্গা। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

পাট্টায়ার খ্যাতিই বলুন আর কুখ্যাতিই বলুন, দুই ই তার রাতের জন্যে। এ শহর সন্ধ্যে বেলায় জেগে ওঠে, আর রাতে তার চোখে ঘুম আসে না। অনেকের কাছে শুনি তাঁরা নাকি পাট্টায়াতে দক্ষিন চিন সাগর (সাউথ চায়না সি) দেখে এসেছেন। কিন্তু দক্ষিন চিন সাগর, থাইল্যান্ড থেকে বহু দূরে। মালয় উপদ্বীপ ঘুরে মলাক্কা প্রনালী পেরিয়ে মাকাউ – হংকং – তাইওয়ানের দিকে গেলে দক্ষিন চিন সমুদ্র পেতে পারেন। সে সমুদ্র বেজায় বেয়াড়া, ভয়ঙ্কর। ওস্তাদ মাল্লারাও সে সমুদ্র পেরোতে কেঁপে যায়। যাঁরা বিভুতিভুষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মরনের ডংকা বাজে" পড়েছেন, তাঁরা মনে করে দেখতে পারেন, বিভুতিভুষন এই সমুদ্র পার হবার কি অপূর্ব বর্ননা করেছেন। দক্ষিন চিন সমুদ্রকে আমি হংকংয়ে এক ঝলক দেখেছিলাম। পাট্টায়াতে আপনি দেখবেন তেলুক সিয়াম, বা শ্যাম উপসাগর, যার বর্তমান পরিচিতি থাইল্যান্ড উপসাগর নামে। সে সমুদ্র শান্ত আর সুন্দর । থাইল্যান্ড উপসাগরের তীর ধরে একটা রাস্তা ধনুকের মত বেঁকে চলে গেছে দক্ষিন থেকে উত্তরে, ঠিক যেন একটা কাস্তে। এ রাস্তার উত্তরের দিকে কিঞ্চিত উচ্চকোটির লোকজনের থাকার জায়গা। হলিডে ইন্ সমেত নামকরা সব পাঁচতারা হোটেল আছে, আছে অনেক গুলো রিসোর্ট, দিব্যি দেখতে, দারুন সাজানো সব বাড়ি, ঘর রাস্তা, দোকান, মল, রেস্তোরাঁ। যত দক্ষিনে আসবেন, ততই ঘিঞ্জি বাড়বে, আর জমজমাটি ও বাড়বে। এ রাস্তার একদিকে সমুদ্র আর তার বেলাভূমি, অন্যদিকে দোকানপাটে ভর্তি ভিড়। রাত যত বাড়ে, পাল্লা দিয়ে বাড়ে লোকের ভিড়। আর দোকান গুলো যদি দেখেন, সেখানে পাবেন না এমন জিনিস নেই। ঘর সংসারের টুকিটাকি, জামা, জুতো, প্রসাধন, বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি, উপহার সামগ্রী। তবে শতকরা তিরিশ ভাগ দোকান হয় খাবারের, নয়ত থাই ম্যাসাজের। দোকানের সামনে এক সারি সুবেশা তরুনি বসে আছেন, আপনি তাদের মধ্যে কোনো একজন কে বেছে নিতে পারেন আপনাকে দলাইমলাই করে দেবার জন্য। তিন চার রকমের ম্যাসাজ হয়। একটা হলো থাই প্রথাগত ম্যাসাজ, যে খানে শরীরের বিভিন্ন অংশে কিছু ভাবে মালিস ও দলাই মলাই করে আপনার পেশী গুলোকে আলগা করা হয়, আর স্নায়ুতন্ত্রকে চাঙ্গা করা হয়। এ ছাড়া আছে ফুল বডি ম্যাসাজ, ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন, তা ছাড়া আছে ফুট ম্যাসাজ, আপনার পায়ের পাতা ও আঙ্গুলের ওপর ম্যাসাজওয়ালির আঙুলের কারিকুরি আর আছে ফিস ম্যাসাজ। একটা গামলায় জল ভর্তি করে আপনাকে পা ডুবিয়ে বসতে বলা হবে। সেই জলে ছাড়া থাকবে কিছু ছোট ছোট মাছ, যারা আপনার পায়ের মরা চামড়া খেয়ে নেবে, আর

পা টা বেশ তাজা লাগবে। নিশ্চিন্তে ম্যাসাজ নিতে পারেন। সত্যিই ভালো লাগবে। খরচাও এমন কিছুই না। তবে এর বাইরেও কিছু কিছু ম্যাসাজ পার্লারে অনৈস্বর্গিক অনেক কিছুই হয়, কিন্তু সে সব নেহাতই শোনা কথা। আমি যে ম্যাসাজ পার্লার দেখেছি, সেখানে এরকম কিছুই নেই। তবে কিনা সাধারন পার্লারগুলোতেও সম্পুর্ন অপরিচিতা এক সুন্দরী আপনার শরীরে দলাইমলাই করে দিচ্ছে ঘন্টাখানেক ধরে, এই ব্যাপারটা অনেকের কাছেই বেশ শিহরন জাগানো অনুভূতি।

শহরের একেবারে দক্ষিনে, কাস্তে রাস্তার হাতলের কাছে, সমুদ্রের ধারে একটা টিলার ওপর বিশাল আকারের রোমান হরফে লেখা আছে পাট্টায়া। এ লেখা আবার রাত্রে আলো হয়ে জ্বলতে থাকে। আর তার কিছুটা আগে, রাস্তার শেষ ভাগটুকুতে সন্ধ্যের পর থেকে গাড়ি চলা বারন। সেটার নাম "ওয়াকিং স্ট্রীট"। শুধু হাঁটা ছাড়াও এ রাস্তার খ্যাতি অন্য জায়গায়। হাজারো কিসিমের নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক মৌজ-মস্তির আড়ত হলো এই ওয়াকিং স্ট্রীট। সন্ধ্যে বেলায় এখানে ঢুকে হাঁটতে থাকুন, সত্যিই চোখ টেরিয়ে যাবে। কত রকমের সাজু-গুজু করে মেয়েরা ঘুরছে, শুধু মাত্র আপনার মনোরঞ্জন করার জন্যে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। রাস্তার ধারে লাইন দিয়ে বিয়ার বার। সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা বসে আছে। তাদের সিংহভাগ থাই হলেও, কিছু অন্য দেশের মেয়েরাও রয়েছে দেখলাম। ভারতীয় ও চোখে পড়লো দু এক জন। ট্যুরিস্টরা এখানে আসবেন, এসে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোন একটা বিয়ার বারে ঢুকবেন, তার পর এই মেয়েদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও বিয়ার চলবে। বিয়ারের দাম, আপনার জন্যে হয়ত ৫০ বাত(Baht), আর মেয়েটির জন্য ১০০। এটাই এখানের দস্তুর। আপনি বিয়ার কিনে না দিলে, কোন মেয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবে না। কিছু আলাপচারিতার পরে পছন্দসই কোনো একটিকে নিয়ে চলে যাওয়া যাবে হোটেলের ঘরে, অবশ্যই কিছু অর্থমূল্য চুকিয়ে। কিছু বিয়ারখানায় নাচা-গানার ব্যবস্থা থাকে। সেখানে কোন নর্তকীকে মনে ধরলে তার সঙ্গে আলাদা আলাপচারিতার ব্যবস্থা আছে। মনে ধরলে তাকেও হোটেলের ঘরে নিয়ে যাওয়া চলবে, তবে কিনা, যেহেতু সে বেতনভুক নর্তকী, তাই বিয়ার বারে কিঞ্চিত পয়সা ক্ষতিপুরন দিয়ে যেতে হবে। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখা দরকার। অত্যন্ত উদ্ভট শুনতে লাগলেও, এই মেয়েদের সকলেই কিন্তু আদতে মেয়ে নয়। প্রায় ২০% আসলে ছেলে, তারা মেয়ে সেজে এখানে বসে আছে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন পছন্দ। থাইদের দেখে এমনিতেই ছেলে-মেয়ে আলাদা করা শক্ত। আর এক্ষেত্রে, এরা এমন ভাবে সেজে থাকে, কে ছেলে, আর কে মেয়ে, সেটা চেনা প্রায় অসম্ভব। কাজেই, সুধী পাঠক, যদি এই বিয়ার বারে পছন্দসই বান্ধবী খোঁজেন, আগে একটু ভালো করে বাজিয়ে নেবেন। তবে কিনা, বিয়ার বার ছাড়াও রাস্তায় অজস্র মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে সেজে গুজে। এদের সঙ্গে বিয়ার বারে গিয়ে বিয়ার খাবার দরকার নেই, গপ্প-আড্ডার ও তেমন ধার ধারেনা এরা কেউ। একদম সোজা সাপটা বিনিময়। যেটা লক্ষ্য করলাম, সেটা হলো, বিয়ারখানায় বসে গপ্প করছে যারা, তারা প্রায় সবাই সাদা ট্যুরিস্ট। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের সঙ্গে যারা দরদস্তুর করছে, তাদের মধ্যে আমাদের দেশী লোকজনের সংখ্যা সিংহভাগ। এদের বিয়ারপান, বা গপ্প আড্ডার সময় নেই। তবে হ্যাঁ, একটা কথা অবশ্যই বলবো। আপনি যদি পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঘুরতে আসেন, আপনার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবেনা, বিরক্তও করবেনা। এত বিয়ারখানা, হাজারে হাজারে বার, কিন্তু একটাও মাতাল দেখিনি থাইল্যান্ডে, দেখিনি রাস্তায় কোনরকম অসভ্যতা বা মহিলাদের অসন্মান করা। মাঝ রাত পর্য্যন্ত রাস্তায় ঘুরুন নিশ্চিন্তে।

পাট্টায়াতে ক্যাবারে আছে। আপনি ক্যাবারে বলতে ইয়োরোপ আর আমেরিকার বিখ্যাত ক্রেজি হর্স শো ভেবে বসবেন না। আবাল্য সংস্কারের মাথা খেয়ে একবারই দেখেছিলাম সেই নাচ। দেখেছিলাম নর্তকীদের অসাধারন সুন্দর জমকালো পোষাক, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে মেয়েগুলোর উর্ধাঙ্গ নিরাবরন। তাই এই ক্যাবারে নিয়ে কিছুটা সন্দেহ ছিলো। এদিক ওদিক খবর নিয়ে জানলাম, এখানে সেরকম কিছু হয় না। অনেক ভেবে, যা থাকে কুল-কপালে বলে ক্যাবারে দেখতে ঢুকে পড়লাম সপরিবারে।

দু খানা ক্যাবারে শো খুব নামকরা। একটা আলকাজার শো, আর একটা টিফানিজ শো। যে কোন একটায় ঢুকতে পারেন। একদম সামনে বসে দেখলে টিকিটের দাম বেশি। নাচা-গানা তো ভালোই হলো। বহু দেশের এবং ভাষার গান এবং নাচ হলো। বলিউড ও ছিলো – "দোলা রে... দোলা রে" বলে থাইরা ভালোই কোমর দোলালেন। তবে আমার ভালো লাগলো একটা চিনে গান ও নাচ। সুরটা ভারি মায়াময়। বহু বছর আগে, রেডিও পিকিং (আমার ছোটো বেলায় পিকিং , বেইজিং হয়। যদিও, রেডিও বলতে এখনো পিকিংটাই মনে আসে প্রথমে) এরকম কিছু গান ও সুর শোনাতো তাদের বাংলা অনুষ্ঠানে। যদিও গানের ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। কেন জানি মনে হলো, এখানে জাঁকজমক হয়ত অনেক বেশি, কিন্তু সেই প্রথম দেখা রামায়নের নৃত্যনাট্যে যেন প্রানের ছোঁয়া আর একটু বেশি ছিলো। ওহো, আর একটা কথা বলে রাখি, যদিও অবিশাস্য শোনাবে, তবুও, এই দুটো শো কিন্তু আসলে লেডি-বয় শো। অর্থাৎ যাঁরা নাচেন, তাঁরা সবাই পুরুষ। যদিও এঁদের আওয়ার গ্লাস ফিগার, সুললিত বাহু ও পদ যুগল এবং বাকি সব শারীরিক লক্ষন দেখে কিছুতেই আপনি ভাবতে পারবেন না এঁরা ছেলে। আমিও পারিনি। একটা দুটো ক্ষেত্রে একটু খটকা যে লাগেনি তা নয়, যেমন গলার স্বর। কিন্তু সন্দেহ নিরসনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। পরে বিশ্বাস না হওয়াতে ইন্টারনেটে খুঁজে দেখে তারপর নিশ্চিত হয়েছি, আর বুঝেছি, কেন ক্রেজি হর্স শো এর থেকে এই ক্যাবারে আলাদা।

একটা সময় পাট্টায়ার খ্যাতি ছিলো শুধুই ওয়াকিং স্ট্রীটের জন্য। কিন্তু গত কিছু বছরে থাই সরকার এই ভাবমূর্তী বদলাবার অনেক চেষ্টা করেছেন। আজকের পাট্টায়ায় শুধু প্রমোদবিলাসী লোকজন নয়, বহু মানুষ পরিবার পরিজন নিয়েও আসছেন। এমনকি আমার তো মনে হলো তাঁদের সংখাই বেশি। পরিবার নিয়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বোধহয় রুশ দেশের মানুষ, তার পরেই আছেন চিনেরা। ভারতীয়দের মধ্যে দল বেঁধে ছেলে ছোকরারা মৌজ-মস্তি করতেও এসেছে, আবার অনেকে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতেও এসেছেন। সেরকম মানুষের জন্যে প্রবাল দ্বীপ (কোরাল আইল্যান্ড) ভ্রমন খুব ভালো একটা পরিকল্পনা। পাট্টায়ার সমুদ্রতীর থেকে সমুদ্রের ভেতরে প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার দূরে একখানা প্রবাল দ্বীপ রয়েছে। পাট্টায়ার সৈকত থেকে স্পীডবোট নিয়ে আসে এই দ্বীপে। স্পীডবোটে যেতেযেতে দূর থেকে ফিরোজা রঙের জলের মধ্যে ঘন সবুজ গাছপালা ঢাকা দ্বীপটা চোখে পড়তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো – "এ তো সবুজদ্বীপ"। আপনি যদি তপন সিংহের "সবুজ দ্বীপের রাজা" ছবিটা দেখে থাকেন, তাহলে আন্দামানের ঠিক এরকম দেখতে একটা দ্বীপকে আপনি দেখেছেন সবুজ দ্বীপ বলে। আন্দামানও কিন্তু আদতে প্রবালের তৈরি দ্বীপ। আমাকে, আমার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বার বার আন্দামানের গল্প শুনিয়েছে, যেতে বলেছে। কিন্তু পোড়া কপাল আমার, আমি কখনো আন্দামান যেতে পারিনি। যদি যেতে পারি, তার বর্ননার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবো আন্দামান। যাইহোক, স্পীডবোটে উঠে সোজা গিয়ে ওই সবুজ দ্বীপে পৌঁছনোর বদলে, আপনি মাঝপথে থামতে পারেন প্যারাশ্যুটে ওড়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে। আপনি যদি আমার মত দুর্বলচিত্ত হন, তাহলে এই রোমাঞ্চ আপনার জন্যে নয়। একমাত্র সাহসীরাই এখানে রোমাঞ্চের স্বাদ নিতে পারেন। এ ছাড়া জলের তলায় ডুবুরি হয়ে প্রবাল দেখতেও যেতে পারেন সবুজ দ্বীপে। সাঁতার জানার দরকার নেই।

সমুদ্রের মাঝখানে একটা বিশাল জেটি তৈরি করা হয়েছে। সেই জেটির পেছন দিকে বসার জায়গা, আর সামনে দিকে কিছুটা খোলা জায়গা। স্পিডবোট আপনাকে এখানে নামিয়ে দেবে। সামনের খোলা জায়গায় গিয়ে দেখবেন অনেকে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে, ঠিক বুঝতে পারছেনা, সাহস করে উড়বে কিনা। ওদিকে সামনে কিছু ইয়ে পাকা ওস্তাদ এগিয়ে গিয়ে লাইফ জ্যাকেট আর প্যারাশ্যুট পরে তৈরি হচ্ছে ওড়ার জন্যে। ব্যাপারটা

কিছুটা এরকম। আপনাকে লাইফ জ্যাকেট পরানো হয়, তারপর আপনাকে একটা প্যারাস্যুটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

আপনার আর প্যারাস্যুটের এই গাটবন্ধন আবার দড়ি দিয়ে জোড়া আছে একটা স্পীডবোটের সঙ্গে। স্পীড বোট নিচে, জলে। আর আপনি জেটির পাটাতনের ওপরে। তার পরে শুরু হয় মাদারি কা খেল। স্পীড বোট আপনাকে টেনে নিয়ে যায়। পাটাতন থেকে যেই আপনি পড়বেন জলে, সেই মুহূর্তে হাওয়া পাকড়ে নেয় আপনার প্যারাশ্যুট, আর মানুষ শূন্যে উড়তে থাকে। স্পীডবোটে করে এদিক ওদিক জলের ওপর ঘুরিয়ে এনে আবার আপনাকে ওই জেটির ওপর নামিয়ে দেবে। অন্যরা প্যারাশ্যুট জড়িয়ে ওখানে দাঁড়ালে আপনি পেছনে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে পারেন। "ওই তো সবাই করছে, আমরাই শুধু ভয় পাই। কিছু হবে না, এরা খুব ভালো করে করিয়ে দেবে"। কিন্তু নিজে উড়বার জন্যে দড়িদড়া বেঁধে ওই খোলা যায়গায় দাঁড়ালেই চিত্তির। হাতের তেলো বরফের মত ঠান্ডা, জিভ তালু শুকিয়ে কাঠ। আপন চতুর্দশ পুরুষের নামগোত্র স্মরনের চেষ্টা, কিন্তু কার্য্যতঃ পিতৃদেবের নামও স্মরন করতে না পারা, যে বা যিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়ে ঠেলে ঠুলে আপনাকে এই বিপদে ফেললেন , মানসপটে তাঁর নামে অশ্লীল শব্দ সমূহের ঘোরাফেরা, আর পরিশেষে তলপেটে প্রবল কনকনে একটা চাপ মত। যারা এই গোটা ব্যাপারটার ব্যবস্থাপনায়, সেই সব লোকেরা আপনাকে অনেক কিছু বলছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে, কিন্তু সে সব শোনার মত অবস্থায় আপনি তখন নেই। একে লাইফ জ্যাকেট, তার ওপর ইঁড়িমিড়িকিড়ি বিভিন্ন দড়ির বাঁধন। সে বাঁধন আবার বাঁধা হয়েছে আপনার অস্থান-কুস্থানের খুব কাছাকাছি জায়গা দিয়ে। আপনি আরো সিঁটিয়ে আছেন তাই জন্যে। পেছনে ফিরে একবার দেখার চেষ্টা করলেন বাকিদের, কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা বোম্বাই হ্যাঁচকা এসে লাগলো আপনার বপুতে। হিড় হিড় করে টানছে কেউ আপনাকে সামনে। যে ছোকরা এতক্ষন আপনাকে ধরাচুড়ো পরাচ্ছিলো, সে ব্যাটাও আপনার কাঁধে একটা চাপড় মেরে আপনাকে বাই বাই করে দিলো। এতক্ষন মনে হচ্ছিলো আপনি ভিতু, এখন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আপনি বিশ্রি রকম অসহায়। পাটাতনের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো আপনাকে, কিন্তু সেটা এক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই পাটাতন শেষ। প্রায় কুড়ি বাইশ ফুট নিচে সমুদ্রের জল। আপনার কানে একটা হুহু করে শব্দ, শিরদাঁড়ায় গঙ্গোত্রীর বরফ গলা জল, তলপেটে একটা কনকনে ঘুর্নিঝড় তান্ডব। যাঁরা প্লেনে চেপে কখনো এয়ার পকেটে পড়েছেন, তাঁরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। শোঁ শোঁ করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছেন আপনি। কমলা রঙের স্যান্ডোগেঞ্জি পানা লাইফ জ্যাকেট আপনাকে জলে ভাসিয়ে রাখতে পারে, এই সম্ভাবনাটাই মাথা থেকে গায়েব হয়ে যায় তখন।

আরো নামছেন, নামছেন, পায়ে সমুদ্রের জলের একটা ঝাপ্টাও বোধহয় লাগলো। কিন্তু হঠাৎ কেউ একজন আপনার কাঁধ, কোমর, পেট জাপটে ধরে ওপর দিকে একটা হ্যাঁচকা টান মারলো। আপনি এক ঝটকায় কিছুটা শুন্যে উঠে গেলেন। আর পড়ছেন না নিচে। প্রথমটা ধাঁধা লাগে, কি ঘটলো সেটা ভালো করে বোঝা যায় না। কিন্তু তার পরে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখবেন প্যারাশ্যুটে হাওয়া ধরে নিয়েছে। আর সে ই আপনাকে উড়িয়ে নিয়েছে। ধড়ে একটু প্রানের স্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে। এ যাত্রা হয়ত বেঁচেই গেলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখুন। আপনার সামনে একটু দূরে পাট্টায়া শহরে উঁচু উঁচু বাড়ি ঘর। নিচে নীল জল, আর তাতে সাদা ফেনা তুলে দৌড়ে বেড়াচ্ছে স্পীডবোটেরা। আপনাকে যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে ডান দিকে ঘুরে একটা চক্কর মারে, আপনি দেখতে পার বহু দুরের সবুজ দ্বীপ, আরো পেছনে থাই উপসাগর আর দিকচক্রবাল। পাখির মত মনে হয় নিজেকে। মনে হয় শুধু উড়ে চলা যেত যদি এই ভাবে। ঠিক যে মুহূর্তে আপনি উপভোগ করতে শুরু করেন, তখনই স্পীডবোট আরো একটা বাঁক ঘুরে আপনাকে জেটির কাছাকাছি নিয়ে এসে গতি কমাতে থাকে, আপনি ও

নামতে থাকেন নিচের দিকে। জেটির ওপর আপনাকে ধরে নেয় কিছু লোক জন। ধরাচুড়ো ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আপনি। মুখে বিজয়ীর হাসি, আর পকেটে আগামী বেশ কিছু বছর ঘরোয়া আড্ডা জমাবার রসদ সংগ্রহ করে।

নানা রকম আনন্দ ও বিনোদনের উপকরনের মাঝখানেও মন খুঁতখুঁত করছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুব বেশীক্ষন টানেনা আমাকে। আমি একটু সৃষ্টিছাড়া আছি। বরং অচেনা কোন শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে বলুন, আমি এক পায়ে খাড়া। আর আকর্ষন করে মানুষ এবং মানুষের কীর্তি। অনেক বছর আগে, সেটা বোধহয় ১৯৮৯ সাল, আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম রাজগীর। সকাল বেলা বেরোনো হলো, যাবো নালন্দা দেখতে। এক ভদ্রলোক, তিনিও বাঙালি, মন্তব্য করেছিলেন, নালন্দায় তো সবই ভাঙাচোরা। সেই বয়সেই কথাটায় খুব অবাক লেগেছিলো। থাইল্যান্ডে আমি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে আর কেনাকাটা করতে আসিনি। হাতে সময় মাত্র পাঁচ দিন। তারই মধ্যে যতটা পারি দেখে নিতে হবে। গ্রাম্য নৃত্যনাট্য মন কেড়েছিলো। ব্যাঙ্ককের রাস্তায় এদিক ওদিক হেঁটে বেড়িয়ে ভালো লাগছিলো। কিন্তু তবুও যেন ঠিক যা মন চাইছে, তার সব কিছুর নাগাল পাচ্ছি না। কোন কিছু চেয়ে, না পেলে, আমার বড্ড খিদে পায়। রাস্তার ধারে অসংখ্য ঠেলাগাড়িতে খাবার দাবার বিক্রি হচ্ছে। আর আগেই বলেছি, দোকানপাটের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ খাবারের দোকান।

থাই খাবারের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। চিনে রান্নার ধারালো স্বাদ যেমন আছে থাই রান্নায়, তেমনি আছে ভারতীয় পাকশালের মাখো মাখো জমাটি বৈঠকি ভাব। আমার কেমন জানি মনে হলো, ভৌগোলিক অবস্থানের মতই, এ রান্না চিনে ও ভারতীয় রান্নার মাঝামাঝি। থাই রান্নায় মশলার ব্যবহার আছে, তবে সেটা উত্তর ভারতীয় রান্নার মত প্রচুর নয়। আর থাই মশলা প্রধানতঃ টাটকা আর কাঁচা সবজি। এদিক থেকে বরং খাঁটি বাঙালী রান্না, থাই রান্নার অনেক কাছাকাছি, যেখানে মশলার ব্যবহার উত্তর ভারতের তুলনায় অনেক পরিমিত।থাই দের আসল খাবার হচ্ছে ভাত। তার সঙ্গে ঝোল আর কিছু তরি-তরকারি। মাছের ব্যবহার খুব বেশি। মাংসের মধ্যে প্রধানতঃ মুরগি আর শুয়োর। পাঁঠার মাংস অজানা। গরুর মাংস খাওয়া হয়, তবে বহুল প্রচলিত নয়। বরং দেখলাম মাছ ছাড়াও আরো অনেক সামুদ্রিক প্রানী খাওয়া হচ্ছে। কিছু আমাদের খুব পরিচিত, যেমন কাঁকড়া-চিংড়ি, আবার কিছু অচেনা, যেমন ঝিনুক, অক্টোপাস বা স্কুইড। তবে প্রধানত সাধারন মানুষের খাবার হলো ভাত আর একটা মাছের ঝোল গোছের ব্যাপার। সেই ঝোলে থাকে কিছু সবজি, মাছ বা মাংস, চিংড়ির মলম, লেবু পাতা আর নারকোলের দুধ। বেশ একটা টক্ মিষ্টি স্বাদ। আমাদের জিভে ভালোই লাগে। রাস্তার ঠেলাগাড়িতে বিক্রি হচ্ছে "সাতে"। এ হলো ইন্দোচিনের কায়দায় তৈরি কাবাব। মুঘলাই কাবাবের বপু স্বাদ বা মেজাজ কোনোটাই এর নেই। কিন্তু অতিশয় হালকা, আর সস্তাও বটে। দশ বাত মানে আমাদের কুড়ি টাকা দিয়ে এক কাঠি তে অনেক গুলো কাবাব পাবেন। আমার তো দিব্যি লাগলো। ছোটো ছোট কাঠিতে গাঁথা সসেজ বিক্রি হচ্ছে। মাংসের সসেজ ছাড়াও রয়েছে মাছ, স্কুইড বা চিংড়ির সসেজ বা বল। মাছ বা মাংসের কিমা করে, সে গুলো লাড্ডু পাকিয়ে বল তৈরি করা হয়েছে। খাবার কায়দাটা দিব্যি। কাঠিতে গাঁথা এই বস্তুগুলোর মধ্যে যেটা যেটা আপনার পছন্দ, সেটা সেটা আঙুল দিয়ে দেখালে দোকানি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলা) সেই কাঠি গুলো তুলে গ্রীলে বসিয়ে দেন। সেটা একটা কয়লার আগুন, আর তার ওপরে একটা ধাতব তারের জাল। একটু পর, সেঁকা হয়ে গেলে, একটু সস্ আর স্যালাড সহযোগে আপনাকে পরিবেশন করেন। সস আবার মূলতঃ মিষ্টি-ঝাল। একটু অদ্ভুত মনে হলেও, মিঠেকড়া স্বাদটা কিন্তু দিব্যি জমে। এর সঙ্গে থাই মানুষজন খান একতাল ভাত। থাই ভাত, আমাদের ভাতের মত নয়। এদের ভাত ঝরঝরে হয়না। কেমন একটা তাল পাকানো চটচটে মন্ড। খুব নতুন আতপ চালের ভাত যেমন হয়, তেমন দেখতে। তবে খেতে খুবই ভালো। থাইরা মূলতঃ এই ভাত খান দিনে ৩ থেকে ৪ বার। আর তার সঙ্গে ঝোল ঝোল কিছু একটা। প্রধানতঃ মাছ বা মাংস আর তার সঙ্গে সবজি দিয়ে তৈরি ঝোল। তাতে নারকোলের দুধের ব্যবহার খুব বেশী। লেবুর গন্ধ ওয়ালা পেঁয়াজশাকের মত

দেখতে একরকম সবজি হয় এখানে, যা এরা প্রায় সব কিছুতে দেয়। এর নাম লেবু ঘাস। যদিও ঘাসের সঙ্গে এর দৃশ্যত মিল কমই। আর তার সঙ্গে কাফির লেবু। পাতি লেবুর মত ছোট্ট লেবু। ঘন সবুজ রঙ। গা টা এবড়ো খেবড়ো আর রঙটা ঘন সবুজ। কাফির লেবুর খোসাটাই প্রধানতঃ ব্যবহার হয় গন্ধের জন্য। যে কোন থাই খাবারই খান না কেন, তাতে এই লেবু লেবু একটা গন্ধ পাবেন। এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয় গালাংগাল বলে আদা জাতীয় এক রকম মূল। দেখতে অনেকটা আদারই মত, তবে রঙ আর স্বাদ গন্ধ অনেক হালকা। অনেক রান্নায় কাঁচা হলুদ ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে পড়ে চিংড়ির মলম। ঘুষো চিংড়ি কে পিষে, কয়েক দিন গাঁজিয়ে সেটা রান্নায় ব্যবহার করা হয়। খেতে কিন্তু বেশ। রান্নার স্বাদ নিছক নোনতা বা চাষাড়ে ঝাল নয় , বরং বেশির ভাগ পদে, হালকা তেঁতুল আর সামান্য গুড় দিয়ে ঘটিদের রান্নার মিঠে-কড়া ভারসাম্যের স্বাদের জাদু এনারাও দেখিয়ে থাকেন। থাই ঝোল বা তরকারি প্রধানতঃ তিন চার রকমের মশলার কম্বিনেশন ব্যবহার করে তৈরি হয়। প্রথম রকম মশলা টক্‌টকে লাল, এবং বলাই বাহুল্য পরের দিন সকালে মনে করিয়ে দেয় আগের দিন কি খেয়েছেন। এর পরে আছে এক রকম সবুজ মশলা আর হলদে মশলা। সবুজ মশলা দেওয়া পদ গুলো খুব হালকা আর সহজ পাচ্য। লাল গুলো ঘোরতর গুরুপাক। কিন্তু স্বাদ ওই লালেই বেশি। হলদে গুলো এই দুই এর মাঝামাঝি। সব দিক থেকেই।

ব্যাংকক শহরটা অতিকায় আগেই বলেছি। আর শহরের চেয়েও যেন বড় অসংখ্য শপিং মল আছে এখানে। ভারতীয় পর্যটককূলের সিংহভাগের গন্তব্য ইন্দ্র শপিং কমপ্লেক্স। একবার ঢুকে দেখার ভিমরতি হয়েছিলো। ঘিঞ্জি শস্তা জামাকাপড়ের দোকান। মাছির মত লোক ভনভন করছে। বেসমেন্টে রাজ্যের ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের বেসাতি। উন্মত্তের মতো কেনাকাটা করে চলেছে ভারতীয় পর্য্যটককূল। তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ আবার বাঙালি। আপনি ব্যাংককে এসে এই যায়গায় না এলে কিছুই হারাবেন না। বিশ্বাস করুন, আমাদের নিউ মার্কেটের মেজাজের ১০% ও নেই এখানে। এই বাজারের বাইরেটা হলো শহরের ব্যস্ততম রাস্তা সুখুম্‌ভিত। আমাদের চৌরঙ্গি যেমন। চৌরঙ্গি প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমি জানিনা খোদার খামোখা কেন এত সুন্দর একটা রাস্তার নাম পালটে জওহরলাল নেহেরু রোড করা হলো। এতে ও রাস্তার বিলক্ষন মানহানী হয়েছে বলে আমি মনে করি। চৌরঙ্গি আমার কাছে চৌরঙ্গি ই থাকবে। যাই হোক, এখানে সুখুমভিতের দু পাশে ঠিক গড়িয়াহাট বা হাতিবাগানের মত হকার্স স্টল। মাঝে মাঝে পা ফেলার জায়গা নেই। আমার ব্যংককের সবচেয়ে ভালো লেগেছে দু খানি চিজ। রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো, আর রাস্তার খাবার। এ ছাড়া জাঁকজমক আমোদ আহ্লাদ বা দর্শনীয় স্থান অনেক আছে। কিন্তু কি জানি কেন, একটাও ঠিক মন ছুঁতে পারলো না। নদীর ধারে, প্রাসাদে, মন্দিরে, বহুতল বিপনীতে, রাজপথে বা হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে, আমি ব্যাঙ্ককে ঠিক ছুঁতে পারলাম না যেন। বড্ডবেশি কেনাবেচা যেন চারিদিকে। আর প্রতিটি মোড়ে মোড়ে রাজা-রানী ও বুদ্ধের ছবি বা মুর্তি। এই যে ব্যক্তি বন্দনা, যতদিন মানুষ ভক্তি অটুট রাখবেন, ততদিন চলবে। কিন্তু কখনো, কোন প্রজন্মে যদি এই ব্যক্তি বন্দনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন কি হবে জানতে ইচ্ছে করে। রাত্রি বেলা একা একা ঘুরে ফিরে হোটেলে ফেরার সময় এক অমায়িক থাই ট্যাক্সি ড্রাইভার ফুটপাথের ওপরে উঠে এসে স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে আমাকে "গুড গাল", "ভেলি নাইস গাল" আর "প্লেটি গাল" দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করার পরেও আমার ভয় কাটাতে পারলো না। সব "গাল" মন্দ তার বৃথা গেল। আমার মধ্যবিত্ত মন হিমালয়ের চুড়ায় হয়ত উঠতে পারে, কিন্তু সামাজিক বিধির ফুটপাত পেরোতে পারেনা। এটা ব্যাঙ্ককের ট্যাক্সি ড্রাইভার বেচারা কি করে জানবে? বাঙালি মধ্যবিত্ত মন আর মূল্যবোধ , ৩৪ বছর ঘর করেও বোঝা যায়নি, আর এ তো এক অচেনা ভিনদেশী মানুষ। এ ঘটনাকে পাঠক কি হিসেবে নেবেন আমার জানা নেই। এমন কি আমি নিজে কি হিসেবে নিয়েছি, সেটাও পরিস্কার করে বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, আমি নেহাতই সাধারন মানুষ। নিজেকে জিতেন্দ্রীয় মহাপুরুষ বলে দাবী করার কোন বাসনা আমার নেই। ব্যঙ্কক শহরে ভালো লাগা আর দুটো

জিনিষের কথা না বললেই নয়। একটা হলো মেট্রো রেল। শহরের পৃথিবী বিখ্যাত ট্রাফিকজ্যামের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায়, আর একটা হলো রঙ-বেরঙের ট্যাক্সি। আমি কোথাও এত রঙিন ট্যাক্সি দেখিনি। কলকাতা, মুম্বাই, নিউ ইয়র্কে দেখেছি ট্যাক্সি প্রধানতঃ হলদে। ফিলাডেলফিয়া বা সান ফ্রান্সিসকোতেও তাই। সিঙ্গাপুর বা হংকং এ ট্যাক্সিতে কিছু রঙ আছে বটে, কিন্তু তা এত ঝকঝকে রঙিন নয়। এখানে ট্যাক্সিতে টুকটুকে লাল, ডগমগে কমলা, মিঠে মিঠে গোলাপি, কচি কচি কলাপাতা সব রকম রঙই পাবেন। দেখলেই চড়তে ইচ্ছে করে।

মেয়ের কথা ভেবে একদিন গেলাম ব্যাঙ্ককের চিড়িয়াখানা দেখতে। আমাদের চিড়িয়াখানা একবার আলীপুর ছেড়ে সোনারপুরে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা হয়েছিলো শুনেছিলাম। কিন্তু তার পরে

বোধহয় ব্যাপারটা বিশেষ এগোয়নি। এখানে দেখলাম চিড়িয়াখানা ব্যাঙ্ককের সোনারপুরেই। মানে শহরের বেশ কিছুটা বাইরে। প্রথমে উড়ালপুল আর আকাশঝাড়ু ব্যাঙ্কক পেরোলাম। তার পর সরু গলি, ঘিঞ্জি রাস্তা আর ভিড়ে ভর্তি বাজারের শহরতলি পেরোলাম। শেষে কেমন ফাঁকা হয়ে এলো চার দিক। একটু সবুজ দেখা যাচ্ছে, ছোটখাটো বাগান। একতলা বা দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে গোলগাল থাই বাচ্চারা খেলছে। সবাই বড্ড হাসি মুখ এখানে। এ দেশের নামের মানে নাকি হাসি মুখের দেশ। কে জানে? হতেও পারে। আগে নাম ছিলো শ্যাম, এখন হয়েছে থাই। রোজ রোজ ওই তম-ইয়াম-কুং বা চিংড়ি আর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলে, আমিও বাকি জীবন এদের মতই হাসতে পারি। থাই রান্নার তুলনা নেই। যাই হোক। চিড়িয়াখানা আমাদের আলিপুর উদ্দ্যানের অন্ততঃ ১০ গুন বড়। আর আমোদ প্রোমোদের উপকরন ও অনেক বেশি। যদি শিশুর মন নিয়ে আসতে পারেন এখানে, তাহলে এই সাফারি ওয়ার্ল্ড নামের চিড়িয়াখানা আপনাকে হতাশ করবে না। এখানে হাতিরা ফুটবল খেলে, ওরাং-উটানরা বক্সিং করে, ডলফিনরা ডাইভ দেয়। তবে কিনা আমার মনে হয় অতিকায় শপিং মলে ঢুকে নিজে নাচার চেয়ে ওরাং-উটানের নৃত্য দেখা ঢের ভালো। মেয়ে খুশ্, তার মা বাপ ও দিব্যি খুশ্। আফসোস লাগে, আমাদের চিড়িয়াখানায় কি এরকম কিছু করা যায় না?

ফেরার দিনের পরিকল্পনাটা একটু দুঃসাহসিক ছিলো। আগে থেকে ব্যবস্থা করা ছিলোনা কোন। কিন্তু মাথায় ছিলো আয়ুখায়া দেখবো। আগেই বলেছি আয়ুখায়া হলো শ্যামের পুরোনো রাজধানী। খোঁজখবর নিয়ে এক ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করে ব্যবস্থা করলাম। বললো তাদের লোক আসবে সন্ধ্যে বেলায় আমার থেকে টাকা নিতে আর কাগজ পত্র দিতে। নাম সেলিন্থিপ। হোটেলের লবি তে বসে অপেক্ষা করছি, নাম শুনে মনে হয়েছিল ইনি মহিলা। পরে ইনি ফোন করে কথা বলার সময় নিশ্চিত হলাম। তাই আর হোটেলের ঘরে ডাকিনি। যদিও ইনি হোটেলের ঘরের নম্বর নিয়েছিলেন। লবি তে বসে দেখছিলাম কোন থাই মহিলা ঢুকছেন কিনা। অনেকেই ঢুকছে বেরচ্ছে। কেউ থাই, কেউ সাদা, কেউ ভারতীয়। ঠিক বুঝতে পারলাম না। লবি তে অনেকেই বসে আছেন। রিসেপশানে এক বিপজ্জনক সুন্দরী ভারতীয় মহিলা ঢুকেছেন দেখতে পেলাম। আকার প্রকারে ঠাহর হল খুব সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী। দেখি রিসেপশনিষ্ট আমার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, আর ওই পাঞ্জাবী মহিলা আমার

দিকেই এগিয়ে আসছেন হাসি হাসি মুখে। একটু ঘেঁটে গেলাম। সামনে এসে খাঁটি থাই টানে ইংরিজি তে বললেন "হাই আই অ্যাম সেলিন্থিপ"। বুঝলাম না পাঞ্জাবী বাপ-মা এরকম নাম রেখেছেন কেন। মহিলা একটা কার্ড দিলেন আমাকে। দেখি তাতে লেখা স্বরণদীপ কাউর। ও হরি, ইনি অভিবাসী ভারতীয়। থাই উচ্চারনে স্বরনদীপ হয়ে গেছেন সেলিনথিপ। পরের দিন যাবার ব্যবস্থা পাকা হলো। শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থা, তাই ঘুম থেকে উঠতে হলো ভোর ৫টায়। সকাল ৬টায় গাড়ি এসে তুলে নিলো। হোটেলের পাওনাগন্ডা মিটিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা-ঝোলা-ঝুলি সমেত উঠে বসলাম মিনিবাসে। টেম্পো ট্র্যাভেলার গোছের গাড়ি। গাড়ি ভর্তি পর্য্যটকের দল। এখানেও সেই এক গল্প। চার তালঢ্যাঙা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এসেছে ডুসেলডর্ফ থেকে। সদ্য বিবাহিত ইতালিয় দম্পতি, ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ। আমেরিকান যুগল। চিনে আর জাপানী কয়েকজন একলা। একজন ব্রাজিলিয়। নেই কেবল ভারতীয়। আমি বসলাম সেই ব্রাজিলিয় ছেলেটির পাশে।ওর নাম এদুয়ার্দো। জিজ্ঞেস করলাম, ব্রাজিলে ঠিক কতজন এদুয়ার্দো আছে ? হাসাহাসি আর ফুটবল নিয়ে গল্প জমে গেলো।

রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। গাড়ি চলেছে মসৃন গতি তে আসলে ৩ খানা মিনিবাস কাঁঠাল বোঝাই হয়ে আমরা চলেছি রাজধানী আর রাজবাড়ি দর্শনে। আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজবাড়ীও দেখা যাবে বলছে গাইড। গাইড একটি কমবয়সি থাই মেয়ে। এতরকমের জগাখিচুড়ি লোকজন আর ভাষা নিয়ে তার ঘাম ছুটছে। তার ওপরে তার নিজের ইংরেজিও বিশেষ সুবিধের না। একবার একটা শব্দ বললো "কোসুমা"। অনেক কষ্টে বুঝলাম বলতে চাইছে কাস্টমার। ঘন্টা আড়াই পর গাড়ির সামনে রাস্তার ডান দিকে গাছ পালার মাথা ছাড়িয়ে একটা সাদা রঙের মিনার দেখতে পেলাম। আরো প্রায় মিনিট দশেক চলার পরে গাড়ি হাইওয়ে ছাড়িয়ে ডান দিকে মোড় নিলো। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম ওয়াত ফু খাও থং। ওয়াত মানে মন্দির। একেবারে গোড়ার দিকটা চার চৌকো, প্রায় একটা ফুটবল মাঠের অর্ধেক। প্রথমে ধাপে ধাপে পিরামিডের মত গড়ন উঠতে শুরু করেছে। শুরুর দিকে ঢাল খুব একটা খাড়া না, বড় জোর ৩০ ডিগ্রি মত। সামনের দিকে সিঁড়ি আছে।সেটা বেয়ে ওঠা যায়। সাদা রঙের প্লাস্টার আর ইঁটের কাঠামো। এ অঞ্চলে পাথরের অভাব বলে, সব কিছুই ইঁটের তৈরি। এমনকি অতিকায় বুদ্ধমূর্তি পর্য্যন্ত। আস্তে আস্তে সেই চারকোনা পিরামিডের ধাপ গোল হয়ে ওপরে উঠতে উঠতে স্থাপত্যের ঢাল শুরুর দিকের তিরিশ ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি হয়ে গেছে, আর শেষে সরু ছুঁচলো চুড়ো যেন আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। অদ্ভুত আকৃতি। এরকমটা দেখিনি আগে। নীল আকাশের পটভুমিকায় শ্বেতশুভ্র মন্দির তার অভ্রংলেহী শিখর নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। এত বড় স্থাপত্য। কিন্তু তবুও এ স্থাপত্যে কোন অহংবোধ নেই, দেখনদারি নেই। বরং মন শান্ত হয়ে আসে, আর মাথা নিচু হয়ে আসে। বৌদ্ধ ধর্ম নাস্তিক। ইশ্বরের অস্তিত্ব নেই এখানে। কর্ম এবং কর্মফলই সব। কিন্তু তবুও এই মন্দিরের সামনে

দাঁড়ালে মন এক অদ্ভুত মেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়। মনে হয় কিছুক্ষন ওই গাছ তলায় বসি, আর চুড়ার দিকে তাকিয়ে, কোন সৃষ্টি কর্তার কথা ভাবি। আমার মত নাস্তিক যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বই স্বীকার করেনি কোনোদিন, তারও এরকম ইচ্ছে করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো নাস্তিকের এই ধর্মে এরকম স্থাপত্যের প্রয়োজন হলো কেন? তবে এখানে শুধু সেই সৃষ্টিকর্তাই নন, যাঁরা এই মন্দিরের পরিকল্পনা করেছেন, এবং রূপ দিয়েছেন, এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধায় মানা নুয়ে আসে। ক্যামেরা বার করে কয়েকটা ছবি তুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনে হলো এই স্থাপত্যকে, এই রূপকে, এই গাম্ভীর্য্যকে ক্যামেরা বন্দী করার ক্ষমতা আমার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। অফিসের ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙেছিলাম বুড়ো বয়সে। সে পায়ে এখনো তেমন জোর আসেনি। তার ওপর পিঠে ভারি ব্যাগ। আমার আগে আগে সিঁড়ি তে উঠছে সেই চার জন জার্মান ছাত্র। সিঁড়ির ধাপগুলো বিরাট বড় বড়। আমাদের সাধারন সিঁড়ির চেয়ে প্রায় দু গুন উঁচু। কিছুটা উঠলেই দম চলে যায়। পাহাড়ে ট্রেক করার অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম, উঠতে হবে দম বাঁচিয়ে রেখে, আস্তে আস্তে। বাহাদুরি করে দুম দাম সিঁড়ি ওঠার চড়ার কোনো দরকার নেই। তাতে একটু পরেই দম ফুরিয়ে যায়। বহু সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলাম।

এটা চুড়া নয়। মাঝামাঝি একটা ধাপ। এর পরে আর ওপরে ওঠা যায়না। এই মাঝামাঝি জায়গায় এসে দেখি, এক চিলতে বারান্দা মত করা, যেখান থেকে বাকি চুড়ার স্থাপত্য শুরু হয়েছে। এই বারান্দা মূল স্তুপের চারিদিক প্রদক্ষিন করে আছে। এখান থেকে নিচে তাকালে বহুদুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এ তল্লাটে পাহাড় পর্বত তো দুরস্ত , সামান্য একটা ঢিবি ও দেখা যায়না। একদম চ্যাটালো জমি, দিগন্ত রেখাও একদম সোজা সাপ্টা। প্রদক্ষিন করে পেছন দিকে গিয়ে দেখি একটা ছোট্ট দরজা। কাঠের পাল্লা ওয়ালা। পাল্লা গুলো খোলা। ভেতরটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। দরজাটা আমার কোমরের চেয়ে একটু উঁচু। সামনে চারজন তালঢ্যাঙা জার্মান ছোকরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে, আমিই এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। মাথা ঝুঁকিয়ে অনেক কষ্টে আমার বপু ওই দরজার খুপরি তে ঢুকিয়ে ৪ টে মূল্যবান তথ্য আবিস্কার করলাম। প্রথমঃ – সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার, নিজের হাত পা দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ঃ – ভেতরে মানুষ আছে, কারন টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। তৃতীয়ঃ- সামনে এগোতে পারছিনা, কারন আমার পিঠের বেঢপ ব্যাগ সমেত আমি সুড়ঙ্গে আটকে গেছি আর চতুর্থ্যঃ আমি পেছিয়েও যেতে পারছিনা, কারন পেছনে জার্মান গুলো ঢুকে এসেছে, আর আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না, কারন সুড়ঙের মুখ আমার বপু আর ব্যাগ সমেত ছিপি আঁটা।

মারো জওয়ান হেঁইয়ো, আউর থোড়া হেঁইয়ো, দম লাগাকে হেঁইয়ো, ইত্যাদি শুনলাম। অবশ্যই জার্মান আর ইতালিয়ান ভাষায়। সামনে ততক্ষনে একজোড়া ইতালিয়ান হাজির। কিছুক্ষন টানা হ্যাঁচড়ার পর হুড়ুস করে আমি ছিপি খোলার মত খুলে এলাম। কিন্তু এলাম না বলে, গেলাম বলাই ভালো। চার জার্মানের ঠেলা সামলাতে গিয়ে পড়লাম সুড়ঙ্গের ভেতরে। তারপর হ্যাঁচড়প্যাঁচড় করে হামাগুড়ি দিয়ে সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুদুর এগোলাম। সামনে টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, তার পরে একটা হালকা হলদেটে আলোর রেখা। দেখলাম ডান হাতি সুড়ঙ্গটা একটু চওড়া। সেখানে একটা ছোট্ট বুদ্ধমূর্তি, আর তার সামনে একজন মুন্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী। থাই দের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হলে ভারি সুন্দর মানায়। মাথা চক্‌চকে মোড়ানো, নাক চোখ ও তেমন চোখা না। কেমন একটা গোল গাল মোলায়েম ভাব। বুদ্ধ মুর্তির সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে, আর কয়েকটা ধুপ। বেশ শান্ত সমাহিত একটা ভাব। কিন্তু কি জানি কেন, আমার মনে হলো, আর একটু খেলে-ছড়িয়ে বন্দোবস্ত করলে বেশ হতো। বড্ড যেন চাপাচুপি। যে ভাবে ভেতরে ঢুকেছিলাম, তার চেয়েও খারাপ ভাবে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন বেলা সাড়ে দশটা। গরমে গন্‌গন্‌ করছে চারিদিক। কিন্তু বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নিচে নেমেও এলাম। সামনে আর একটা মন্দির। তবে তার আকার তত বড় নয়। ভেতরে ঢুকে দেখি অজস্র মূর্তি। সিংহভাগ বুদ্ধমূর্তি হলেও বাকি মূর্তির মধ্যে আছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, যম রাজ এবং খুব সম্ভবতঃ মা সরস্বতি। কয়েকটি মেয়ে, খুব সম্ভবত আমেরিকান, দেখলাম সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তির সামনে নানা রকম পোজ দিয়ে ছবি তুলছে। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বসে আছেন এখানে। মুখে হালকা হাসি। কিন্তু কেন জানি মনে হলো হাসির আড়ালে কিছুটা অসন্তোষ লুকিয়ে। সামনে গিয়ে বললাম আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি। আমি বুদ্ধগয়া ও

সারনাথ দেখেছি। বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সত্যিকারের হাসি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে আশীর্বাদ করলেন, তার পর ঘুরিয়ে দেখালেন মন্দির। ফু খাও থং মন্দির থেকে চললাম ঘুমন্ত বুদ্ধকে দেখতে। থাইল্যান্ডে যেখানেই যান না কেন, এনারা, কোন্ শায়িত ও ঘুমন্ত বুদ্ধ কত বড়, তার একটা জটিল হিসেব নিকেস পেশ করেন। মিনিবাস থেকে নেমে যে অতিকায় বুদ্ধের সামনে দাঁড়ালাম, সেটা আগাগোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি, ওপরে প্লাস্টার। শুনলাম ইউনেস্কো থেকে এই মুর্তিকে সংরক্ষন করা হয়। গাইড মেয়েটিকে একটু আড়ালে জিজ্ঞেস করতে বললো দশ বছরে একবার করে চুনকামের পোঁচড়া টানে। সেইটাই সংরক্ষন।

অতিকায় বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে আবার মিনিবাসে ওঠা। ওয়াত মাহাদাত। সেটা কাছেই। যেতে দশ মিনিটও লাগলো না। বুদ্ধমূর্তি ছিলো মাঠের মাঝখানে, ঠাঠা রোদ্দুরে যেন ঝলসাচ্ছে সবকিছু। এতো রোদের মাঝে কেউ ঘুমোতে পারে এইটাই যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না। ওয়াত মাহাদাত পৌঁছে দেখি, সেখানে গাছের মেলা। অশ্বত্থ গাছের ছড়াছড়ি। বেশ ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা একটা ভাব। গাইড মেয়েটি খুব উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বললো, কিন্তু সেটা বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম মাথা নিয়ে কিছু

বলছে। কিছু না বুঝতে পেরে সামনে এগোলাম। বাকি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে। একটা বড় অশ্বত্থ গাছের তলায় সবাই কিছু একটা দেখছে। এপাস ওপাস কনুই মেরে সামনে গিয়ে দেখি হাসি মুখে গৌতম বুদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। গৌতম বুদ্ধ। এত জীবন্ত মূর্তি আমি দেখিনি। আরো অদ্ভুত কি জানেন? মূর্তি বলতে শুধুই মাথা। আর তার চারিদিকে গাছের কান্ড আর শাখা প্রশাখা। ঠিক যেন মাথাটা গাছের ভেতর থেকে উঁকি মারছে। জমি থেকে প্রায় দু হাত উচুঁতে এই মাথাটা দেখে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। পাথরের স্থাপত্যকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরেছে একটা গাছ। ইশ্বরহীন মানব ধর্মের প্রবর্তক তথাগত বুদ্ধের পাথরের নিস্প্রান মুর্তিকে তুলে ধরে রেখেছে এই গাছটা। পাথরের মুর্তিকে সজীব করেছে। তথাগত যেন বলছেন - কে বলেছে আমি নেই? এই তো আছি, এখানে। এই মাটিতে এই বিশাল গাছের শেকড়ের চেয়েও গভীরে মানবিক ধর্মের বিশ্বাস আর মূল্যবোধ চলে গেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী গেছে। বর্মি দস্যুর হাতে আয়ুথায়া ধ্বংশ হয়েছে। কিন্তু আমার শিকড় এখানে এতটাই গভীর, যে কালের নিয়মে ধ্বংশ আর মৃত্যুর ধাক্কা তাকে স্থানচ্যুত করতে চাইলেও জীবন তাকে ঠিক আগলে ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। পাট্টায়ার "ওয়াকিং স্ট্রীট" দেখে থাইল্যান্ড কে চিনো না। শ্যামদেশ কে চেনো এইখানে এসে। এই প্রথম বার এদেশে এসে মনে হলো শুধু বৌদ্ধ ধর্ম নয়, আমার ও কিছু একটা আছে এখানে। বিস্ময়ের তখনো বাকি ছিলো।

একটা ঝুপ্স্ দোকানে ভাত আর ঝোল খেয়ে পৌঁছোলাম ওয়াত ফ্রা সি সানফেত। মানে ফ্রা সি সানফেতের মন্দির। এটা ঠিক একটা মন্দির নয়। স্তুপ আছে অনেক গুলো, আবার গুলো মন্দিরও আছে। তাদের মধ্যে একটি মন্দির আবার জীবন্ত। মানে সেখানে এখনো পূজোপাট হয়। সেই মন্দিরের নাম ফা মঙ্খনবোফিত। এখানে মন্দির এবং প্রাসাদ চত্তর অনেকটা ছড়ানো। বড় রাস্তা থেকে একটা পায়ে চলা বীথি চলে গেছে মন্দিরের দিকে। সেই পথ একটা ছোট্ট খাল পেরিয়েছে ছবির মতো একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে। ওপাশে আবার গাছ পালার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলা। কানে একটা হাল্কা সুর ভেসে আসছে। প্রার্থনা সঙ্গীতের মত

কিছু একটা। গাছ পালার ফাঁক দিয়ে মন্দিরটা দেখতে পেলাম। সামনে একটা মাঠ, তার মাঝখানে রাস্তা চলেছে মন্দিরের দিকে। আস্তে আস্তে প্রার্থনার শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। সে সুর কেমন, তা কথায় লিখে বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। চটুল সঙ্গীত নয়, কিছুটা হয়ত একঘেঁয়ে, কিন্তু কি অপার্থীব আমি লিখে বোঝাতে পারবো না। একটা অলস ভাব, একটা ভাবাতুর সমর্পন রয়েছে সে সঙ্গীতের সুরে। যেন জাগতিক সব কিছুর বহু ওপরে কোন এক শান্তির খোঁজ। গানের ভাষা বুঝিনি। কিন্তু মনে হচ্ছিলো এ গান উঠে আসছে বহু যুগের ওপার থেকে, শ্যামদেশের হৃদয় থেকে। আর এ দেশের সেই হৃদয়ে প্রান প্রতিষ্ঠা করেছেন ভারতবর্ষ থেকে আসা সন্ন্যাসী আর ভিক্ষুরা। মন্দিরের ভেতরে অতিকায় ধাতব বুদ্ধমূর্তি। সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত করার বদলে চিবুক উঁচিয়ে তাকালাম তথাগতের দিকে। মনে হলো এ তো আমার নিজের আপন আমার খুব চেনা কোনকিছু! ধুপ জ্বালালাম। দক্ষিনার বাক্সে থাই ২০ বাতের নোট ঢুকিয়ে দিলাম, আর তার পর কি মনে হওয়াতে পকেট হাতড়ে একটা ভারতীয় পাঁচ টাকার কয়েন ও দিলাম। মন্দিরের বাঁ পাশে আয়ুত্থায়ার সব চেয়ে বড় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন – ওয়াত ফ্রা সি সানফেত।

যখন দাঁড়ালাম এই মন্দির, স্তুপ আর প্রাসাদের ভগ্নস্তুপের মধ্যে, প্রথমেই মনে হলো কিছু কিছু যেন খুব চেনা। আয়ুত্থায়া বহু শতক ধরে শ্যামের ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে। এখানে রাজারা থাকতেন। প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিলো আয়ুত্থায়া। কিন্তু আজকের আয়ুত্থায়াতে আপনার চোখ কেড়ে নেবে এখানকার মন্দির, স্তুপ আর বুদ্ধমুর্তি। নজর এড়াবেনা, এই সব স্থাপত্য আর মুর্তিতে ভারতবর্ষের প্রভাব থাকলেও আদতে এগুলো শ্যাম দেশের একান্ত নিজেরই। হয়ত এই ভাবে, এইখানে সূদুর অতীতে আমারই মত হয়ত কেউ এসেছিলো ভারতবর্ষ থেকে। এবং এখানে যে বীজ ছড়িয়েছিলো, সেই অঙ্কুর আর মহীরুহে পরিনত হয়েছে। আর মাটির বহু গভীরে তার শেকড় ছড়িয়ে গেছে। মনে করতে চেষ্টা করলাম সেই অদেখা পূর্বপুরুষকে। বহু বছর আগের যে পথ ধরে তিনি এসেছিলেন, আমি সেই পথে আসিনি। তিনি যে উদ্দ্যেশ্যে এখানে এসেছিলেন, আমি তার ধারে কাছেও যাইনা। তবুও আজকে এত শতাব্দী পরে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার পূর্বপুরুষের পদাঙ্কে, এটা ভাবতেই কেমন গায়ে কাঁটা দিলো। এই মুহুর্তটাই থাইল্যান্ডে আমার সেরা মুহুর্ত। নিজেকে আবিস্কার করা একটা আনন্দ আর বিস্ময়। ঠিক এরকম একটা কিছু দেখতেই আমি যেন এসেছিলাম এদেশে। প্রতিটি স্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে, প্রতিটি মন্দির বা ভাঙ্গা বুদ্ধ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নতুন করে শ্যামদেশ কে চিনলাম। এতদিন এদেশে এসে ঠিক যেন মন ভরছিলো না। আজ এইখানে সেটা হলো। স্থানীয় জনজাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট বজায় রেখে ভারত থেকে আগত ধর্ম কে আর সংস্কৃতিকে গ্রহন করেছে। আর আত্তিকরন হয়ে তৈরি হয়েছে আজকের থাইল্যান্ড। স্বরনদীপ কাউর নয়, সেলিনথিপ। ভারত এখানে মিশে গেছে শ্যামে। সেটাই ওর আসল নাম। আয়ুত্থায়ায় দাঁড়িয়েই বলে এসেছি, আবার আসবো। সেলিনথিপের দেশে।

-Summer blooms of Bengal.

Artist- Samaresh Mukhopadhyay

Runa Mukherjee Parikh
Sabarmati, Gujrat

Maya

Maya removed the gold bangles she was wearing from her journey. It was a long second flight, twelve hours to be precise.

Her gold earrings had bothered her in the flight as well, hurting the ear on the side she dozed off. For someone who had loved wearing silver jewelry all her student life, she wondered when she started wearing gold so religiously. Marriage came to mind.

Brushing the thought aside, she looked at her reflection in the mirror. Her eyes stared back at her blankly. This was one of the happiest places on earth. It was Durga poojo, the happiest time of the year. But her face, like her body, didn't believe it.

At the very beginning, Durga poojo was all about eating chicken rolls for Maya. As a Bengali living in Delhi, chicken rolls were a big part of what made her childhood Bengali. And the rolls were special alright. To begin with, they weren't made at home by Ma. Being outside food made them tastier right away.

These rolls were made by one sweaty man who stood behind a stove all evening. First, he flattened the dough with a rolling pin and then stretched the roti to its limits with his pudgy fingers. Maya had not started suffering from OCD yet so it was all fine to her, the dough and his fingers mashing into each other.

Next came the deliciously concocted affair of meat and onion. The greasy mix of the juicy chicken with the pungent onion and garlic made for one of the most divine food stuffings, Maya had ever come across. As the man took a handful and heaped it on her roti, she could feel a dull throbbing in her veins. Very soon, this gorgeous little delicacy would be in her mouth.

Buying them on her own had become possible because the nine-year-old Maya was given a coin or two every day by her father. She religiously put it inside her piggy bank, a brown mud vessel with a slot. There were days in the month when she really wanted to buy and eat a candy or two but the only way, she could get her hard-earned coins out was if she broke the vessel into pieces. So, she resisted. She waited for the grand finale that was approaching her in October instead.

On the D Day, she counted every coin, satisfied that the amount crossed eighty rupees. That meant she could have a chicken roll on each day of poojo. Oh, the freedom of being able to buy something on her own, at any hour of the day she pleased. Ma and Baba did not even ask how she was spending her money. But she had a suspicion that they already knew she wouldn't think beyond food when it came to spending money.

As the chicken rolls melted in her mouth, she remembered what her Ma would say over lunch on wintry afternoons, "Glorious food, isn't it, shona?"

Today, as Maya slowly removed every piece of clothing and went for a warm bath, she realized a smile was playing on her lips. The thought of a little girl with a satisfied heart and tummy had somehow made its way into the body of a melancholy thirty-five-year-old woman.

-

The washroom with its light blue walls and a bright white light right over the mirror took Maya back to the many times she had had conversations with her Ma here who, almost always, was cleaning the sink.

"Ma, why doesn't Baba ever clean the basin?" she had once asked her Ma.

"Because according to Baba, the basin is never dirty," she had answered.

The twelve-year-old never really understood what her mother meant because as far as she knew, men were turning out to be a fascinating species. Boys had started to take notice of the tomboy who spoke and laughed loudly and so, Durga poojo had assumed greater significance. Maya could wear jeans and tees the year round but not when Uma came a calling. She remembered her Ma getting taken aback one time they were shopping together.

"I will not buy corduroy pants, Ma! And definitely not a size bigger just so it fits me next year too!" she told her Ma in exasperation that day. Instead, she bought a maroon, knee length frock, green denims, a purple kurta and a pink salwar kameez. It was a good mix of attires and her Ashtami morning was made when Ujjwal from next door said she looked beautiful.

It was the first year a boy walked her home. It was also the year her Ma had no role in her poojo celebration, from what she wore to who she befriended.

--

In the next few years, Maya discovered that she loved serving bhog during poojo. Splattering dollops of khichudi and labra on the banana leaf plates of the thousands who came to her pandal gave her a sense of authority and achievement. Bang under the autumn sun, she stood and served bhog, wearing her Ma's sarees, looking like her younger version and slowly understanding how beautiful her Ma actually was.

And it was here that she met Arjun. Over messy ladles of hot khichdi, they fell in love and had their first date surrounded by the cacophony of a vibrant collective. She had worn her Ma's red lehriya, a saree that had literally been the only topic of conversation since she had left the house that Navami. The boys were casually hinting at losing their hearts to Maya. But she had already lost hers, to the soft-spoken Arjun.

Later that night, the moon's radiance shone in Maya's face, as she felt butterflies in her stomach. First love had arrived, along with the kaash flowers and her beloved goddess.

--

In the autumn of 2012, Maya returned for her first Durga poojo in three years. She had married and moved to New York where her husband worked and lived. Returning home for poojo wasn't easy anymore. After years of trying to make a plan with the husband, she decided to head to Delhi alone instead.

But poojo had moved on without her. Maya found that her friends were all happy in their little cocoon that did not accommodate her anymore. She was the only one who had married someone out of the large social circle, and it made her an outcast along with her husband. Her friends made her a part of every plan but she didn't really belong. Within two days, she understood what her Ma meant when she said, "Durga pujo aar amaar nei, eita ekhon toder..amar pujo Port e hoto.."

Maya's grandfather worked in the Port Trust of India, and her Ma had grown up in the vicinity. The first of three daughters to a loving father and a stern mother, her Ma probably remembered the festival of her carefree childhood more fondly than anything.

-

As she emerged from her bath, Maya felt years of memories wash away. She opened what used to be her mother's wardrobe. It was full of sarees, the ones she had stopped wearing over the years. Up until that moment, she had no interest in even acknowledging them. But today she found herself caressing the silkiness of the pink and yellow one right in front of her. Without knowing why she was doing it, she took it out of the closet and spread it on the bed and sat next to it. A little bit of dust flew up from the bed as she did.

The bedroom had her Ma's presence in every corner – Maya remembered her Ma cleaning out the closet, dusting the bed, reading magazines on the bamboo chair near the window where the sunlight streamed in. The list was endless.

Her mother, like all mothers, had roamed around the house more than her father could even imagine. She had made every nook a livable space. From the tribal masks that welcomed the guests at the entry of the house to the fake white Dahlias hanging lazily inside a plastic bottle at the balcony wall, her Ma had made the home what it was. Even today, when sitting in her cozy flat in New York, if she closed her eyes in nostalgia for a moment, she saw her Ma, holding a

bowl of mushoorir dal with a pair of steel tongs, bringing it to the dining table as Maya sat, waiting patiently for her mother to mash her bhaat with the dal and make little balls out of them for her to eat.

Or she would remember the time in the afternoon that both mother and daughter would lie on the sofa or carpet and watch a mundane TV show. Maya couldn't remember the name of the show, only that she watched it religiously with her mother for so many years together.

--

Maya came out and sat at the dining table where her father was already having his bowl of cereal. The sound of a conch blowing gave way to a dhak that took its turn and musically ran over all the houses on their lane. Ashtami poojo had started at its usual time.

"Baba, aarek baar cha khaabe?" Maya asked.

Her father, suddenly looking ten years older than his actual age, nodded. Maya got up and went to the kitchen. As she measured two cups of water and poured them in the pan, she realized her Durga poojo had changed yet again.

Instead of a new sari, she was wearing her mother's. Instead of giving pushpanjali, she was trying to understand how much companionship her solitary father might require in the coming days.

Instead of Ma Durga, it was her own mother who was filling her thoughts. As bright as only memories can be, her Ma smiled at her, happy with how the tea was simmering just right.

"This way, it will be perfect, neither too bland, nor too bitter," she heard her Ma say.

Maya nodded and smiled at yet another sage advice from Ma.

--

Urmi Dutta Roy
London

My journey through grief and the long road ahead

I lost Mum to Ovarian Cancer a little over two and a half years ago. To say the experience was traumatic would be an understatement. Mum was diagnosed eleven months prior to passing away. During her illness our family went into crisis management mode, hoping and praying for a miracle despite all the medical facts presented and feeling utterly helpless.

The Cancer was brutal on Mum and by extension on us as a family. In such a short time this cruel disease took hold in a vice like grip and wasn't going to let go until it ravished her, which it did in May 2016. In addition, my Dad who had been uber positive about Mum's recovery all the way through her treatment had a heart attack ten weeks before Mum passed away and had to have life-saving double 'Heart Bypass' surgery. For the last weeks of Mum's life, she was in a hospital on one side of London with my Dad fighting for his life on the other. Both were worrying about each other and my sister and I spent our days rallying between the two with my aunt (Mashi) as support. You really could not make this stuff up or the events which ultimately unfolded. Dad made it but Mum didn't and those are the facts.

Being a solutions focused person, one of the hardest things to accept was that in some situations you have absolutely no control in an outcome. I solve problems for corporates for a living but when it came to solving the most important problem of my life, the one that mattered the most, I was powerless in saving Mum from Cancer. Believe me when I say our family tried everything but Mum's situation worsened, she couldn't eat or drink anything, had lost so much weight, was hooked up to various tubes until she was no more. Being powerless is a bitter pill to stomach and challenged my entire belief system that if one worked hard towards an outcome, then said outcome would be achieved. Instead I failed, I failed to save Mum and I carry that failure around with me all the time.

Losing a loved one, especially a parent who for most people are a significant pillar in their lives is devastating. Memories haunt you and sadness becomes a constant companion. Confusion envelopes and it feels like I'm in an alternate universe where Mum is no more whilst the rest of the world are happily carrying on as if nothing has changed in their paradigm. The two worlds don't converge or at least not just yet.

Both my sister and I started therapy and whilst I cannot speak for my sister, it has been a mixed bag of emotions. My therapist advised that grief is a deeply intimate and personal journey, one that cannot be rushed to meet anyone else's timeline but your own. The manifestations of grief will be different for everyone. For me this presented itself in loss of sleep, panic attacks, crying on the tube journey to and from work, irritability, rashes across my arms and legs which started when Mum was diagnosed, restlessness and experiencing flashbacks of Mum in her dying days. In addition, my self-esteem and confidence was non-existent, I was constantly questioning myself when making decisions, at least outwardly. My therapist diagnosed me with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Most people associate PTSD with those exposed to war zones but it is also something which can manifest in people who have experienced stressful, frightening or distressing events.

Going to therapy has highlighted that I'm unable to openly talk about Mum and that my feelings are kept just under the surface in order for me to function on a daily basis. My therapist tells me I need to find an outlet to process my feelings otherwise they will consume me. However, what that mechanism is, is a mystery to me. Friends have suggested I write down my feelings as a way to process my grief and that brings us back to this open essay where I am attempting to do that. My Mum was a complex, determined, cultured and ultimately kind woman. I could probably write a whole thesis on her alone but whatever I could say would not do her justice, so I won't.

Rather frustratingly instead of people allowing me to process my grief in my own time, I had certain family members and friends suggest that getting a boyfriend or husband would help my recovery. I found this suggestion highly offensive and wondered why in this day and age, do people think a man would immediately wipe away my grief. It is a nonsense to think the patriarchy have the power to do this and who the hell do they think they are?!? The pitying looks I receive sometimes make me feel both angry and distressed. Having spoken at length with my counsellor, I can now see this suggestion put forward by many was preposterous and others need to understand a person has to go through their own grief journey in their own time before they can form healthy relationships with new people. Getting together with someone will not alleviate the grief one is going through and many societal groups need to open their eyes to this.

‘The 5 stages of Grief’ model developed by Elizabeth Kubler-Ross describes that people who experience the loss of a loved one, goes through a number of emotional stages not necessarily in a particular order. These include denial, anger, bargaining, depression and acceptance. After two and a half years I tend to fluctuate around the depression stage and it is tough. Depression for me manifests itself in lack of sleep, self-care and exhaustion. The motivation to carry on is worn thin and there is risk that one day I will give up. However, I look to my sister and my Dad (Baba) and force myself to wake up each day, taking one step at a time. The road ahead is long and I don’t know at what point if ever, I will wake up and not feel like I am drowning or being swallowed up by life.

Since Mum passed away there have been other losses too, it is almost as if death is becoming more and more part of our lives. With each passing moment there is more heartbreak around the corner and I never quite feel I get enough time to recover from one life shock before another curveball is launched. Increasingly it is evident that society need to consider better ways to process the deluge of grief that surrounds us. Reaching out, asking for support and being kinder to oneself is critical for survival. Yet, why do so many of us struggle with asking for help. Mental health is critical and so many of us suffer in silence. This fact is truly heart breaking.

For now, all I can promise myself is that I will get up each day and take each 24 hours at a time and that to me is survival. Wish me luck!

Artist- Sudeshna De

পিয়া সেনগুপ্ত
আটলান্টা

আমার চোখে কাজী নজরুল ইসলাম

দিনটা ছিল ৭ই ডিসেম্বর ২০১৮, হঠাৎ দেখলাম আমার ফোনে মেসেজ এলো আমার খুব কাছের একজন মানুষের কাছ থেকে যিনি একাধারে আমার শিক্ষিকা, আমার প্রিয় মাসীমণি কল্পনা মাসি। মেসেজ ছিল আমি যেন কবি নজরুল সম্বন্ধে একটি লেখা লিখি, আমাদের পূজারীর অঞ্জলি পত্রিকার জন্য। মন আনন্দে ভোরে উঠলো তৎক্ষণাৎ, কথা অমান্য করি এই সাধ্য আমার সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা উৎকণ্ঠা শুরু হলো কারণ এতো বড় একজন প্রবাদপ্রতিম মানুষকে কলমে কি করে সীমাবদ্ধ করবো সেই চিন্তায় দিন দুয়েক গেল। মাসীমণির কাছে দুদিন সময় চেয়ে নিলাম, কিন্তু তার কথা অমান্য করি এই সাধ্য আমার নেই। তাই বুকে সাহস সঞ্চয় করে লিখতে বসলাম সেই কিংবদন্তি মানুষটি কে নিয়ে।

‘অঞ্জলি লহো মোর’ গানের কলি বাঙালির জীবনে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে আছে। আমি আজ লিখবো একটি অধ্যায় কিছু জানা অজানা তথ্য নিয়ে আমার প্রিয় সেই স্বনামধন্য, কিংবদন্তি কবি নজরুল ইসলাম কে নিয়ে যিনি ছিলেন একাধারে সংগীতজ্ঞ, দার্শনিক, নাট্যকার এবং ছিলেন তিনি এক বিশাল ঔপনাস্যিক।

২৪শে মে ১৮৯৯ এক শুক্রবারে চুরুলিয়া গ্রামে কবির জন্ম হয় এক দরিদ্র মুসলিম কাজী পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম। তাঁকে ছোটবেলায় সবাই “দুখু মিয়াঁ” ডাকতো। দারিদ্র্যতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারে নি, তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে পড়েছিলেন ইসলাম দর্শন ও তার সাথে সাথে বাংলা এবং সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। পড়াশুনার পাশাপাশি কবির ভীষণ আগ্রহ ছিল থিয়েটারে। তিনি সেই সময় এক যাযাবর নাট্যগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়ে যান. সেই দলের জন্য গান, কবিতা লেখা শুরু করেন। শকুনি বধ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশা, বিদ্যান হুতুম ইত্যাদি একের পর এক লিখতে শুরু করেন। এইভাবে এগিয়ে চলে তাঁর কর্মযজ্ঞ, বিকশিত হতে থাকে তাঁর অপূর্ব লেখনীর ভান্ডার।

এরমধ্যে তিনি যখন দশম শ্রেণীতে, সেই সময় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়ে তিনি ভর্তি হয়ে যান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি ১৯১৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লেখেন বিদ্রোহী, ভাঙা গানের মতো কবিতা এবং ধূমকেতুর মতো সাময়িকী। কবি নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন, বলা ভালো সবাই তাঁকে বিদ্রোহী কবিই বলতেন, কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। তাঁর চিন্তাধারা, বিশ্বাস এবং কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের উপর অত্যাচার, সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

কবি রচনা করেছিলেন প্রায় ৩০০০ গান যা আমাদের কাছে নজরুলগীতি হিসাবে পরিচিত। তিনি লিখেছিলেন শ্যামাসঙ্গীত, হিন্দু ভক্তিগীতি, কীর্তন, দেশাত্মবোধক গান। লোকগানেও তাঁর অস্তিত্ব ছিল অবাধ। বাউল, ঝুমুর, সাঁওতালি এবং ভাটিয়ালি বহু গান আমরা পেয়েছি তাঁর সম্ভার থেকে। তাঁর রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে ভৈরব রাগটির প্রকাশ বহুবার পেয়েছে।
হিন্দু ভক্তিগীতি "বলিস ননদিরে সই, আমি কুল ছেড়ে চলিলাম...শ্রীকৃষ্ণ নামে তরণিতে প্রেম যমুনার নীড়ে" । বাউল গানের মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন "আমি বাউল হলাম ধূলির পথে লয়ে তোমার নাম "। ঝুমুর গানের মধ্যে একটি গান "ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে" খুবই প্রচলিত ছিল। দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে আপাত বাঙালী প্রায় সকলেই এই গানটি জীবদ্দশায় একবার হলেও শুনেছে অথবা গানটি গেয়েছে, সেটি হলো "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে" ।

কবি নজরুল যিনি ছিলেন এক প্রকৃত সঙ্গীত সাধক, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি লিখেছিলেন হিন্দু ভক্তিগীতি "আমার আনন্দিনী উমা আজও আসেনি তার মায়ের কাছে", ঠিক তেমনি লিখেছিলেন "আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ, এই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হজরত", তাঁর হাত ধরে প্রতিটি মানুষের মনেপ্রাণে, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে ছিলো। বৈবাহিক সূত্রে তিনি আবদ্ধ হয়ে ছিলেন এক হিন্দু নারী প্রমীলা দেবীর সাথে।

নজরুল তার কবিতা ও গানে বাংলা ভাষার উল্লেখ ছাড়াও পার্শিয়ান ভাষার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। লিখেছিলেন বাংলা গজল। আমির খস্রু যদি ভারতবর্ষে গজল এনে থাকেন তাহলে বাংলায় প্রথম গজল আনেন কবি নজরুল। লিখেছিলেন অবিস্মরণীয় গান "আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন, দিল ওহি মেরা ফাস গয়ি" । গান রচনা ছাড়াও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন সচিন সেনগুপ্তর লেখা বিখ্যাত 'সিরাজ-উদ-দৌল্লা' তে।

দেশ জুড়ে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে সেই সময় নজরুল ইসলাম এর প্রধান কাজ বা লক্ষ্য ছিল শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান করে তাঁর রচিত ও সুরারোপিত বিদ্রোহী দেশাত্মবোধক গান গাওয়া, এবং সেই সব গানের মাধ্যমে প্রকাশ হতো অন্যায়, অত্যাচার এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই সেই গানের মাধ্যমে অনুপ্রেরিত হয়ে এগিয়ে আসতো অন্যায় ও অবিচার এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা ছিল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি। জেলে বন্দি দশায় লেখেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' ।

কবির লেখা 'সঞ্চিতা' নামক কবিতার বইটি প্রতিটি বাঙালির ঘরে ঘরে ছিল তখন এক পরম ধন। নজরুল লিখেছিলেন সেই কালজয়ী কবিতা 'অভিশাপ', যেখানে তিনি বলেছিলেন "যেদিন আমি হারিয়ে যাবো, বুঝবে, সেদিন বুঝবে, অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে, বুঝবে সেদিন বুঝবে" । লিখেছিলেন তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপটে "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছো জুয়া" । বিদ্রোহী কবি নজরুল ছিলেন প্রতিটি মানুষের মননে। পরাধীন দেশের মানুষের দুঃখকষ্ট, অভাব এবং অত্যাচার তাঁকে কাঁদাতো, তাঁকে আরো বেশি করে বিদ্রোহী কবি করে তুলেছিল সেইসময়।

এরপর যখন দেশ ভাগ হলো, সেই সময় অশান্ত পরিবেশে কবি জাতি ও দেশের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন সেই প্রাণ ছুঁয়ে যাওয়া গান "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" । মানুষে মানুষে বিভেদ কবিকে করে তুলেছিল ক্ষতবিক্ষত, তাই তাঁর লেখা গান ও কবিতা কে অস্ত্র করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন শান্তির বার্তা, মৈত্রীর বার্তা।
জীবনদর্শন তাঁর ছিল জলের মতো স্বচ্ছ, শিশুর মতো সরল ও পবিত্র, তাই সারাটি জীবন ধরে মানুষের কথা ভেবে মানুষের পাশে থেকে সকলের মঙ্গলের কথা ভেবে প্রতিবাদ যেমন করেছিলেন তেমনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ যাতে মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে সেই কারণে লিখেছিলেন তাঁর গান, কবিতা, এবং উপন্যাস। এটাই ছিল তার মাধ্যম, যার দ্বারা তিনি মানুষের অন্তরে ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলেন।

কবির লেখা বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘বাধনহারা’, ‘মৃত্যুক্ষুধা’, ‘কুহেলিকা’, ‘সাম্যবাদী’ এইরকম বহু উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন তখনকার সমাজ ব্যাবস্থার প্রেক্ষাপটে। তাঁর লেখা শিশুদের জন্য বাংলা কবিতা ‘খুকি ও কাঠবিড়ালি’, ‘লিচু চোর’, ‘খাঁদু দাদু’ ইত্যাদি ভীষণ ভাবে নান্দনিকতা এনেছিল। ১৯২২ সনে কবির লেখা বিখ্যাত কবিতা সংকলন ‘অগ্নিবীনা’ প্রকাশিত হয়, যার প্রতিটি কবিতা বিশেষভাবে বাংলা কাব্যের জগতে পালাবদল ঘটিয়েছিল। কবিতাগুলির মধ্যে ছিল বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’, ‘কামালপাশা’, ‘খেয়াপারের তরণী’ ইত্যাদি।

বিশ্বকবি রবীদ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৩ সনে বিদ্রোহী কবি নজরুল কে উৎসর্গ করেন তাঁর ‘বসন্ত গীতিনাট্য’ গ্রন্থটি, যখন কবি নজরুল ছিলেন আলিপুর এর কেন্দ্রীয় কারাগারে, এতে বিদ্রোহী কবি বিশেষভাবে উল্লসিত হয়ে আনন্দে লিখেছিলেন সেই অসামান্য কবিতা ‘আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’।

১৯৬০ সালে নজরুল সম্মানিত হয়েছিলেন ‘পদ্মভূষণ’ খেতাবে, তাছাড়াও তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্মানিত হয়েছিল ‘একুশে পদক’ এবং "Independence award "-এ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বলতে গেলে তার আরোগ্য লাভ ছিল অসম্ভব। বিদেশেও তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। ১৯৭২ সনে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবি নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়, বাকি জীবন তাঁর সেখানেই কাটে। এরপর ১৯৭৬ সালে ২৯ সে আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নাসির আহমেদ
আটলান্টা

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সংগীতের প্রভাব এবং রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট।

কোন মহান সৃষ্টির পিছনে যেমন পরিবেশের অনেক প্রভাব থাকে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভা বিকাশের মূলেও তেমনি ঠাকুর-পরিবারের সংগীতের পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। বাংলাদেশে আধুনিকতার সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। অভিজাত পরিবারে তখন উচ্চাঙ্গসংগীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। ঠাকুর পরিবার উচ্চাঙ্গসংগীতের চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পরিবারের ছেলেমেয়েদের শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীত শেখানোর জন্য একজন গৃহশিক্ষক সবসময়ই নিযুক্ত থাকতেন। এরমধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তীর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এঁর কাছেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতের হাতেখড়ি। বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রচলিত পাড়াগেঁয়ে ছড়ায় হালকা সুর বসিয়ে সহজ ছন্দের গান ছেলেমেয়েদের শেখাতেন। এছাড়া ছিলেন যদু ভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকা গোস্বামী, এবং আরও অনেকে। রবীন্দ্রনাথের দাদারাও সকলেই উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাড়ীর ব্রহ্ম-উপাসনায় গাহিবার জন্য এঁরা সকলেই হিন্দী গান ভেংগে ব্রহ্মসংগীত রচনা করতেন।

বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মজলিষ বসত প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়। এছাড়া দূর্গাপূজার সময় হতো আগমনী বিজয়ার গান। কখনো অজানা গায়করা বাড়ীতে আসতেন অতিথী হয়ে। দিনরাত গান হতো তখন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিশেষ ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি কিছু কিছু গাইতেও পারতেন। তাঁরই উৎসাহে তাঁর পুত্রগন সংগীতের ক্ষেত্রে কালজয়ী হয়েছিলেন। পুত্রগনকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ সংগীত সাধনার জন্য এক হাজার টাকা এবং রবীন্দ্রনাথকে তার মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত ‘‘নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে’’ – গানটির জন্য পাঁচশত টাকা পুরষ্কার দিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের মেয়েরাও সংগীতচর্চা করতেন এবং সর্ব সমক্ষে গান গাইতেন।

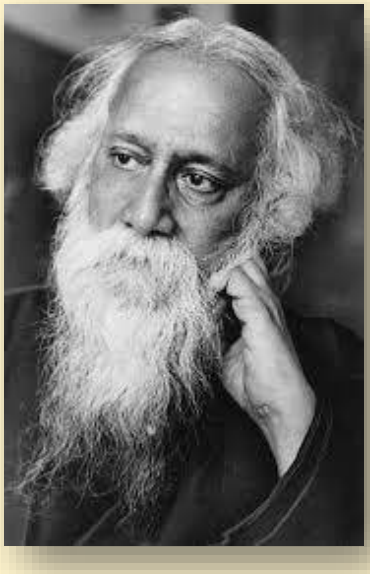

ঠাকুর পরিবারের এই জমজমাট গানের আবহাওয়ায় কারো পক্ষেই গানবাজনার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ বাড়ীর অন্যান্যদের মতো নিয়ম-মাফিক ভাবে গান শেখেননি। বিধিবদ্ধ শিক্ষা না হলেও সুরের যে আবেষ্টনীতে তিনি বড় হয়েছেন, তাতেই গীতরসের তরঙ্গউচ্ছাসে তাঁর মনপ্রাণ দোলায়িত হতো। বাড়ীতে দিনের পর দিন সংগীতের যে অবিরাম ধারা বইত, তাতেই তাঁর বালকমনে সুরের ইন্দ্রজাল আঁকা হয়ে গিয়েছিল। গানের চর্চার মধ্যে বেড়ে ওঠার জন্য খুব সহজেই গান তাঁর প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

প্রথম জীবনে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিলেন। জ্যোতিদাদা তাঁকে পাশে বসিয়ে পিয়ানোয় নানা সুর সৃষ্টি করতেন, আর রবীন্দ্রনাথ সেগুলিতে কথা বসিয়ে পূর্নাঙ্গ গান রচনা করতেন। এভাবেই তাঁর গান রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী শুরু হয়েছিল। বস্তুতঃ সুর এবং সংগীত রচনার ক্ষেত্রে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তার অন্যতম মূল প্রেরণা ছিলেন তাঁর জ্যোতিদাদা।

কবিগুরুর সংগীতের বৈশিষ্ট অল্প কথায় প্রকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর যেমন ছিল গভীর অনুরাগ, তেমনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি ইয়োরোপীয় সংগীতে-সংস্কৃতির প্রতি। তাকেও তিনি গ্রহন করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির কাজে। কিন্তু প্রকাশকালে দেখা গেল তার একটি সমন্বয়ধর্মী ভারতীয় রূপ।

রবীন্দ্রসংগীত কাব্যধর্মী। সুরের সঙ্গে কবিতার এক অভূতপূর্ব মিলন। সুর ও বাণীর গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে সমানভাবে। গুরুদেবের নিজের কথায় "আমার মনে যে সুর জমেছিল, সে সুর যখন প্রকাশ হতে চাইল, কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোনটা বড় আর কোনটা ছোট বোঝা গেল না" ।

ঠাকুর বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অবিরাম চর্চার মধ্যে বেড়ে ওঠার দরুন তাঁর মনে কালোয়াতী গানের ঠাঁট আপনা আপনিই জমে উঠেছিল। আর এর সাথে গ্রাম বাংলার অপরূপ লোকসংগীতের সুর যথা, কীর্তণ, বাউল ইত্যাদির সুরের সাথে উচ্চাঙ্গ সংগীতের এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্রসংগীত ধ্রুপদ-আশ্রিত সনাতনী একটি সুর। বাংলার নিজস্ব লোকসংগীত ও কীর্তণ মূলতঃ দু-কলির সুর, অর্থাৎ স্থায়ী এবং অন্তরা – এই দুই ভাগে বিভক্ত। কবিগুরু হিন্দী ধ্রুপদ, টপ্পার অনুকরণে চার কলি ও দু-কলির অসংখ্য গান রচনা করেছেন। কিন্তু ধ্রুপদের মত চার কলি তথা, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ – এর গানই সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এমনকি পাঁচকলি থেকে দশ কলির গানে তিনি গানের প্রথম চার কলিতে তিনি ধ্রুপদের নিয়মে সুর যোজনা করেছেন এবং পরবর্তী বাকী কলিতে পর পর ব্যবহার করেছেন সঞ্চারী ও আভোগের সুর।

তাঁর নিজের ভাষায়, "সংগীতের একটি অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে 'আমাকে দেখো, সুর বলে 'আমাকে। …. তাল জিনিসটা

সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। ···. তাল ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক – সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নহে। ···. আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়" । (সংগীতচিন্তা, পৃঃ ৬)

কবিগুরু তাঁর গানের ভাব, সুর, ও ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন মাত্রা ও বিভাগের তাল প্রবর্তন করেছেন, এমনকি, ভাবের ও সুরের পরিপূর্ণ প্রকাশের খাতিরে তিনি অনেক গানে তাল সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত মোট ৬টি তাল হলো, ১) ঝম্পক (৫ মাত্রা, ৩।২ ছন্দে); ২) ষষ্ঠি (৬ মাত্রা, ২।৪ ছন্দে); ৩) রূপকড়া (৮ মাত্রা, ৩।২।৩ ছন্দে); ৪) নবতাল (৯ মাত্রা, ৩।২।২।২ ছন্দে); ৫) একাদশী (১১ মাত্রা, ৩।২।২।৪ ছন্দে); এবং ৬) নবপঞ্চ তাল (১৮ মাত্রা, ২।৪।৪।৪।৪ ছন্দে)। রাবীন্দ্রিক তালের প্রধানতম বৈশিষ্ট হলো, এই তালে কোনো 'ফাঁক' বা 'খালি' নেই, এবং সবগুলিই বিষমপদী ছন্দের তাল।

সুরের সঙ্গে বাণীর, প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সুরের ধারার মিলন, ছন্দের বৈচিত্র– সব মিলেই রবীন্দ্রসংগীত আপন বৈশিষ্টে চির উজ্জ্বল।

"গান সম্বন্ধে আমার অহঙ্কারের বিষয় আছে। পূর্বে কত অযত্ন, অবজ্ঞা, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সবাই। কিন্তু আমি জানতুম বাংলাদেশকে আমার গান গাওয়াবই। সব আমি জোগান দিয়ে গেলুম; ফাঁক নেই। এ না গেয়ে উপায় কি। আমার গান গাইতেই হবে– সব কিছুতে" । (শ্রীমতী রাণী চন্দ, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১২৬)

সীমিতা চক্রবর্তী
আটলান্টা

ঋষিকেশের পথে

ঋষিকেশের পথে ২০১৭ তে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কেমন করে যেন হয়ে গেলো। পাড়ায় হাঁটতে গিয়ে প্রতিবেশীর কাছে খবর পেলাম যে দেরাদূনে নতুন এয়ারপোর্ট হয়েছে, দিল্লী থেকে ফ্লাই করা যায়। ঠিক করলাম আমাদের বড় পুত্র মিলন কে নিয়ে ঘুরে আসা যাবে এই যাত্রায়। সে এবার ভারতে আসছে দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি ফ্লাইট বুক করলাম এবং তার সঙ্গে দুদিনের জন্য হোটেলও। আমার বোন যে হোটেলটি সুপারিশ করলো তা পেলাম না। কিন্তু অনলাইন Orbitz এ আরেকটা হোটেল মনে হলো ভালো, বুক করে ফেললাম।

আমরা তিনজনে ২৫ শে ডিসেম্বর দিল্লী থেকে সকালের ফ্লাইটে পৌঁছে গেলাম দেরাদূন। ঝকঝকে দিন। তবে প্লেন ছাড়তে দেরী হওয়াতে পৌঁছাতে বেশ বেলা হয়ে গেলো। হোটেলে পৌঁছে মনটা খারাপ হয়ে গেল। একেবারে রাস্তার উপর ছোট হোটেল। পয়সা দেওয়া হয়ে গেছে, কি আর করা! ঘর দেখতে গেলাম।

ঘরে গিয়ে দেখি বেশ ভালো মোটামুটি সব আছে। কিন্তু যখন জানালার পর্দা টানা হলো, তখন মন ভরে গেলো। সামনে গঙ্গা আর পাহাড়ের এক অপূর্ব দৃশ্য। গঙ্গা মোর নিয়েছে সামনে। ঘরটা তিনতলায় সামনের দিকে- পুরো জানালা ছাদ অবধি। পাশের ঘরটা আরো সুন্দর। কোনার দিকে বলে, দুপাশে জানালা- তাই পুরো দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। যমুনা আর গঙ্গা দুপাশ থেকে মিশছে।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের ঘর দেখিয়ে বল্লেন, "আপনারা চা খেয়ে নিচে চলে আসুন আমি আপনাদের ত্রিবেণী ঘাটে আরতি দেখাতে নিয়ে যাব।" আমরা ছ'টা নাগাদ নিচে নামলাম। ম্যানেজার রেডি। শুনলাম, হেঁটেই ঘাটে যাওয়া যাবে।

আমরা ম্যানেজার এর সাথে রাস্তা পার হয়ে দেখি, সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গা অবধি। গঙ্গার পাড় দিয়ে সুন্দর রাস্তা হাঁটার। গোধূলী লগনে সূর্য অস্তের আলোতে আমরা হাঁটতে লাগলাম ঘাটের দিকে। শীতের সন্ধ্যায় রাস্তায় লোকের অভাব। ছবি তোলার অগাধ সুযোগ। রাস্তার মাঝে মাঝে যাত্রীদের জন্য ঢাকা দেওয়া বসার জায়গা। ভীড়ের সময় নিশ্চয় যাত্রীদের খুব কাজে আসে। আমরা কাজে নামলাম। ছবি তোলার জন্য সূর্য নামছে গঙ্গার ওপরে। পাহাড়গুলো কালো, আর গঙ্গা লাল হয়ে যাচ্ছে সূর্যাস্তের আলোয়। প্রকৃতি নিজের মনে ছবি আঁকছে, আর আমরা আমাদের ক্যামেরাতে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে। কিছুদূর এগুতে ভেসে আসলো গানের সুর। অপার্থিব পরিবেশ। বুঝলাম, আমরা এসে গেছি ঘাটের কাছে। যদিও তখনও ঘাট চোখে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই দেখি সামনে গঙ্গার মন্দির।

মন্দিরটি একেবারে অন্যরকম। চারিদিকে খোলা উঠানের মতো, ছাদ শুধু ঢাকা দেওয়া। না আছে মূর্তি, না আছে বেদি। যদিও মন্দিরের বাইরে মহাদেবের একটা মূর্তি বেশ বড়ো, কিন্তু পুজো হয় বলে মনে হলো না। সবাই নদীর দিকে তাকিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়েছে। দেশী বিদেশী মেশানো দর্শক। নিচে নদীর ধারে সাত জন পুরোহিত আরতির জন্য জোগাড় করছেন। প্রত্যেক পুরোহিত এর জন্য বিশাল প্রদীপ আর একটা ঘন্টা নদীর ঘাটে তৈরী করে রাখা। সূর্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে একদম ঘড়ি ধরে একসঙ্গে ঘন্টা বেজে উঠলো, আর শুরু হলো এক অপূর্ব গঙ্গা আরতি। ঘন্টা, প্রদীপ আর ভজন আমাদের সবাইকে নিয়ে গেলো এক অন্য জগতে। প্রকৃতির মন্দিরের সঙ্গে তুলনা হয় না কোনো মানুষ-গড়া মন্দিরের। মাথার ওপরে তারা ভরা আকাশ। সামনে গঙ্গা যমুনার সম্মিলিত জলের তরঙ্গ আর কালো পাহাড়। শীতের ঝকঝকে রাত্রির বিশাল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দর্শক। দলের ফোন ও ক্যামেরা চালু হয়ে গেলো। মিলনও দেখলাম ফোন এ ছবি তুলছে। ভালো লেগেছে, তাই মনের কোঠায় ধরে রাখার চেষ্টা। এই অনুভূতিই হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুপ্রাণিত করেছিল বেদ বেদান্ত রচনা করতে। অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছি কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। মনে হলো আমরা স্বর্গ আর মর্তের মাঝখানে হারিয়ে গেছি এক অন্য জগতে। একেই হয়তো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলে, যেগুলো আমাদের জীবনের পাথেয়। আরতি শেষ হলে, তীর্থযাত্রীরা সব প্রসাদ হাতে নিজের নিজের হোটেলের পথে যাত্রা করলো। আমরাও হোটেলের পথে এগোলাম, স্মৃতির কোঠায় মূল্যবান মণি রত্ন নিয়ে। গঙ্গায় শালপাতায় ভাসিয়ে দেওয়া প্রদীপ গুলি আমাদের সঙ্গে ভেসে ভেসে সঙ্গী হলো এই সুন্দর রাত্রে।।

ঋষিকেশের ত্রিবেণী ঘাটে গঙ্গা আরতি

অনিমা মজুমদার
আটলান্টা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

এই পৃথিবীর শুভেচ্ছা ভালবাসায় অগাধ আন্তরিকতায় অগাধ হৃদয়বত্তার আনন্দ উছলান আলোর দ্যুতি ঝলকান শক্তি সাহস প্রয়াস প্রকাশ নিয়ে সৃষ্টির উচ্ছাসে আবির্ভূত এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নারী পুরুষ --

আজ নারী দিবস-- আন্তর্জাতিক--

নর নারী--

নারীর পূর্ণতা নরতে নরর পূর্ণতা নারীতে--

কেউ একা নয় পূর্ন -সৃষ্টি নয় পূর্ণ-পৃথিবী হত গোলাকার গোলা, প্রাণহীন পাথর, কাঁকর ও নোনা জল। নর নারীর মিলন সুগন্ধ হৃদয়বত্তা ব্যতীত-

প্রকৃতির শুভেচ্ছা ভালোবাসার অনন্তদোলা জীবনের রূপ কথা-বহমান ঋতুর

প্রবাহ, জীবনের গীত গান-রঙে রঙীন গুলালের রঙ হয় না হৃদয় ঝরা,

এই দুই হৃদয়ের হৃদয় হারান কথা ছাড়া-

জীবনের পদক্ষেপে, মদনের ফুলশর, ফুলমালা, চন্দনের সুরভিত সুগন্ধ, জীবনকে দোলায়, ভাসায়, হাসায়-

হাতে হাত ধরে চলে, দেয় জীবন অঙ্গীকার-

শান্তি শান্তি শান্তি--

থাকেনা কোলাহল-

দেয় জীবন পূর্ণতা -

কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণীত জীবন প্রবাহে কোলাহল, দুঃখ, বেদনা, সুখ যে জীবনের

রঙে হোলির কাদা জল-

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ভাবাক, জাগাক, জানাক, ছড়াক নারীর শুভ কারী

কর্মকারিতার জগৎ শুভ করি শক্তি, সাহস, স্নেহ, ভালবাসার সুগন্ধ বার্ত্তা-যা

জীবন যাত্রায় দীপিত সান্ধ্য মাটির প্রদীপ - যে প্রদীপের অনুজ্জ্বল শিখাও

সক্ষম হয় দিতে ঘরে উজ্জ্বল আলোর জীবন প্রভা--

জীবনের চলার পথটি নারী পুরুষের মিলন সখ্যতায় ভাব ভালোবাসায় হতে পারে, সহযোগিতার ঐক্যতানে মিলিত যাত্রা-এই সমন্বয়ের সুরেতালে গানে বাধা সুর, বাঁধে জীবনের ভীত - যা জীবন প্রবাহে, জীবনের জয়ে, জীবনের স্থাপন-স্থিরতায় হয় সুস্থির।

প্রাগ ইতিহাস ক্রমান্বয়ে আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠা বেয়ে বেদ উপনিষদের স্তুতি চারণায়, পুরাণ মহাকাব্যের উপস্থাপনায়, সমাজ সংসারে সুস্থিত হয়েছে সমাজ সংগঠনের ধারাবাহিকতায়।

শিক্ষাদীক্ষা, আবিষ্কার,জ্ঞান বিজ্ঞানের মহা সোপান বেয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের শাখা প্রশাখায় আজ মানুষের কর্মকারিতার জয়গান জাগরণের সাথে, চিন্তা ভাবনার উত্থান পতনের ধারা বিধারায়, সমাজ সংসারের পথ যাত্রায়, সমাজ যেন আজ হতাশা গ্রস্থ পরিত্যক্ত স্নেহ ভালোবাসার ধ্বংস স্তুপে দাঁড়ান এক রাজভূমি- যাতে আছে হীনতার জড়তার হায় হায়।

জীবনের জীবন মেলায় প্রাণপূর্ণ আসরে আলোর আলোয় দোদুল্যমান ফুলের মালা মোহমায়ার মাধবীলতার চাহনির হৃদয় দোলায়, বুকের কুলে ভেসে বেড়ায়, প্রানের হিল্লোল-যুগল যাত্রায় প্রানের এই হিল্লোল, আতরের সুগন্ধ উতরোলে, জাগায় হৃদয়ের গান- যা হৃদয় ভরান, ঝরান, প্রেম ভালোবাসা আর বন্ধনের গান-এই বন্ধন জীবনের সুর, জীবনের প্রাণ- থাকেনা দেওয়া নেওয়া পাওয়া না পাওয়ার, হিসাব নিকাশ-

যদি এমনই হতো, তবে তো জীবন হতো পূর্ণতায় ভাসমান ভেলায় ভেসে বেড়ানো এক দিগন্ত শোভা- তাত হবার নয়।

জীবনের মালা জীবনের ফোটা ফুলের সুগন্ধ, সবই শুখা ফুলের ঝরা পাতা যেন আজ--

নারীর শক্তি, নারীর সাহস, নারীর সেবা, নারীর জীবন-নদীর ধারা-

যদি তার পাশে পুরুষ তার শুভ বুদ্ধিরপ্রকাশ নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে দিত সুদৃহ

সহায়তা তাহলে সমাজ সংস্কার দেশ দশ বিশ্ব পরিশেবায় হতো উল্লেখযোগ্য কথা- হতোনা সামাজিক অবক্ষয়ের চিন্তায় সন্ত্রস্ত আজকের সমাজ-

সমাজ আজ জঙ্গলময়- সমাজ বিরোধীদের অত্যাচার আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আচমকা (অধুনা) লোকালয়ে ঘূর্ণিপাক খাওয়ার মতোই যেন সঙ্কটিত অবস্থা।

পুরুষ নারীর বিভেদ বুদ্ধিতে সমাজ সংসারে লেগেছে হায় হায়- এই হায় হায়ে নারী পুরুষ সমান দায়ী।

সংসার মানুষের ঠাঁই সংসার ছাড়া জীবন বাঁচে না। সংসার সমাজ তৈরি করে- সমাজ করে গোষ্ঠী- গোষ্ঠী থেকেই দেশ বিদেশ মহাদেশ। সৃষ্টি স্থিতির মহা মিলনে নারী পুরুষ নিজ নিজ অবদানে মহত্বের কর্মকারীতায় অপূরণীয় অনবদ্য প্রতিভার অধিকারী।

নারী দিবসের আন্তরিক প্রার্থনা নারীর শুভ বুদ্ধি, শুভ ইচ্ছার, শুভ চিন্তার হোক গঙ্গার মর্ত্তাভিসারী অভিযান। যা সতত সত্য রূপে প্রকাশিত হয়ে আপন মহিমায় হোক প্রজ্জ্বল।

পুরুষ তার শুভ বুদ্ধির সৎ ব্যবহারে সদাই বহির্মুখী। নারী জীবন নৌকার গুন, খুঁটিতে রশিতে বন্ধনে বাঁধে তার জলকেলি। সকল অস্থিরতায় আনে সে ধীরতা স্থিরতা। নারী সহনশীল, গৃহমুখী গৃহের প্রাণ- ব্যতিক্রম যদিও থাকে। মহাপুরুষ, মহামানব, মহাজ্ঞানী, মহানগুরু মহান শিক্ষক- তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবন আলোর পথ প্রদর্শক। মহামানবী ও আছেন- তারা চির প্রণম্য চির শ্রদ্ধেয়।

আজ নারী দিবস -আন্তর্জাতিক- এই দিবসে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই প্রার্থনায় আজ সমাজ, দেশ, জাতি নমিত যে আমাদের নারীরা পুরুষরা সমাজ সংসার দেশ দশের মঙ্গল কামনায় "মালাবন্ধন", "রাখি বন্ধনের" সহ যোগীতায় বা আপন আপন সংস্কার সংস্কৃতির অনুসরণে সকল বন্ধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সত্যতা নিয়ে সমাজ সংস্কার দেশ দশ বিশ্ব কল্যানে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন ধর্ম রক্ষা করুন। ঘর সংসার সমাজ দেশ বঞ্চিত না হোক। সন্তানরা সমাজ সংসার দেশ দশের ভবিষ্যৎ। তাদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন জীবনের সুগন্ধ বাতাবরণ কেড়ে নিয়ে পুরুষ নারীর বিতর্ক মেলায় তাদের জীবনের মৌচাক যেন না হয় মধুশূন্য।

নারী শক্তি পুরুষ শক্তির বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজনহীন। পৃথিবীর গুন টানায় সমাজ সংস্কার দেশকালে এই দুই শক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহীয়ান। শুদ্ধ ভাব, শুদ্ধ ভাবনা,শুদ্ধ চেতনায়, হৃদয় জ্ঞানে, সকল হৃদ্যতায় আবদ্ধ হয়ে নারী পুরুষের জীবন- জগৎ সংসারে করুক শুদ্ধ যাত্রা। নারীদিবসে আজ এই কামনাই করি।

দেওয়ালীতে প্রদীপ মালার দোল, হোলিতে রঙের খেলা, এ সবই জীবনের কথা, জীবনের ভাষা, জীবনের প্রান- বন্ধনহীন জীবনের জলে, বানে না ভেসে যাক জীবনের সুখ, জীবন না হোক "আয়লা", "সুনামী" জীবন না হোক টর্নেডো- না আসুক জীবনে ফ্লোরিডার হুতাশ ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুধুই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয় পুরুষ ও সমান শ্রদ্ধেয়। পুরুষ নারী একে অন্যের পরিপূরক। জীবন, দেশ, পৃথিবী সমাজ সংস্কার অন্তরিত এই পূর্ণতায়। জীবনের পূর্ণতায় জীবনের গান, জীবনের যুদ্ধে জীবনের জয়। পৃথিবী মহান, জীবন, যৌবন, বাল্য, কৈশোর, শৈশব মহান।

এই মহান যাত্রায় পৃথিবী সফল, উদ্ভাসিত তখনই যখন নারী পুরুষের মিলন বন্ধনের একাত্মতায় দুইয়ে দুইয়ে চার হাত হয় একাকার। জীবনের শেফালী সুবাস জীবনের বাগানে বাতাসে সদা পায়না প্রাণ, দেয়না প্রানের দোলা। প্রকৃতির খামার যখন সুজলা সুফলা তখন প্রকৃতির জীবন্ত প্রাণ ঘরের মা, বোন, জায়া অপ্রকাশ্য ওড়নার প্রচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকে তার গুমোট ভ্যাপসা মনের ভাপ দিয়ে তার হৃদয় তাপ -

তবু কঠোর কঠোরতায় স্বার্থপরতা ও নারীর অন্য আর এক রূপ- যা ঘর ভাঙ্গে প্রাণ নেয়। সব নারী মায়ের মমতা ভরা নয়, সব নারী নিজের ক্ষুধার গ্রাস অন্য কে দিতে পারে না। আধুনিকতার বানের জলে ভেসে আসা বিষ বাষ্প বাসনার জঞ্জালে আজ স্তূপীকৃত জীবন। সমাজ হতে চলেছে উৎশৃঙ্খল। সব নারী আজ ললিত লতার সুললিত ভঙ্গিমায় নয় দুলিত- প্রাণ মনের দোলায় প্রায়ই তারা দেয় বিশৃঙ্খল বাসনার উস্কানী।

ব্রহ্মাণ্ডের ভাইব্রেসনে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তির শক্তিতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। সেই শক্তির মৌলিকতাতেই প্রাণ সৃষ্টি- যে প্রাণে থাকে শুভ অশুভর মনন চেতনা, যে চেতনায় সমাজ সংসারের সকল অশুভতা দূরীভূত হয় মানুষের অন্তর গভীরতার মৌলিকতায়।

এই পৃথিবীর সৃষ্টি তালুকে সৃষ্টির কারিগর আমাদের নারী। তাই পূর্ণতার মাঝে শূন্যতার স্থান অতি নগন্য। শূন্যতাতেই মানুষের অন্তর গভীরতায় মৌলিকতা সমাহিত- সেই মৌলিকতায় নারীজাতি স্বয়ংসিদ্ধা। নারীর অন্তর গভীরতায় যে মৌলিকতা সমাহিত সেই মৌলিকাতার বাতাবরণে স্বয়ংসিদ্ধা নারী তাই মা, বোন, জায়া, কন্যা। সেই নারী" মাতৃ রূপে "পূজিতা"।

পৃথিবী ঘুরছে নিরালায়-

ঘুরছে পৃথিবী আপন সত্ত্বায়-

পৃথিবীর ডালপালা হৃদয় তুফানে

আছাড় পিছড়ে

ছন্দ হারিয়ে খোঁজে

ছন্দিত সাজান বরণ ডালা-

-সেই বরণ ডালা হাতে নারী

মহিয়ষী মহান-

শিল্পী- চৈতালি মুখার্জী

শবনম সুরিতা
জার্মানি

দূরপাল্লার যাত্রাগান

২০১৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্যে একটি বিশেষ বৃত্তি পেয়ে আমি ডেনমার্কে পড়তে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সুবাদে ইউরোপের খান দশেক দেশ দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্ত বিদেশে আছি বলেই মহানন্দে আছি এমন ধারনা আমার গোড়ার দিকে থাকলেও কয়েক মাসেই সেটা কেটে গেলো। যা বুঝলাম, কেতা-কায়দা সবই আছে, কিন্ত বাড়ি-পরিবার-বন্ধুদের চেয়ে প্রায় সাত হাজার মাইল দূরে থাকলে আর যাই হোক না কেন একাকীত্বটাই বেশি জাপটে ধরে। অগত্যা আশ্রয় খুঁজলাম আমার আবাল্যকালের পুরনো বন্ধুর কাছে। ভাগ্যিস গান ছিল! নয়ত ইউরোপে এসে আমি নির্ঘাত অবসাদ বাধিয়ে বসতাম।

যেদিন প্লেনে চেপে দুবাই থেকে কোপেনহেগেনে এসে জানতে পারলাম আমি তারপরের ফ্লাইট মিস করেছি, কিছু ভালো করে বোঝার আগেই সমস্ত চিন্তা-ক্লান্তি উধাও। হবে নাই বা কেন? বকবক করার একজন সঙ্গী পেয়ে গিয়ে আমার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। রেনে'র সাথে এয়ারপোর্টেই আলাপ। ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক, পেশায় স্ট্রীট পারফর্মার। নিউ ইয়র্কের রাস্তাঘাটে-আনাচে-কানাচে গান গেয়ে বেড়ান। এয়ারপোর্টের বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে অনবদ্য নকল করে দেখালেন পিট সিগারকে। সেই শুরু! আর তারপর থেকে এই গোটা বছরে কত যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার শেষ নেই।

স্পষ্ট মনে আছে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর শেষের কোন এক সন্ধ্যে। আমি আর আমার বন্ধু সোনা তখন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। খোলা আকাশের তলায় হাজার হাজার মানুষের সাথে আমরা নেচে চলেছি। আর মুক্তমঞ্চে গাইছে লোকগানের দল, এনকার্দিয়া। চারদিকে তাকিয়ে বুঝলাম কেউই কারো ভাষা বুঝতে পারছি না, অথচ তাতে কিছুই বদলাচ্ছে না। আমরা নেচে যাচ্ছি, গেয়ে যাচ্ছি আর আমাদের চারপাশের মানুষগুলি একে একে জীবন্ত এক একটা গান হয়ে উঠছে।

আমার ইউরোপে অন্যতম প্রিয় দেশ জার্মানি। ডেনমার্কের পাট চুকিয়ে বর্তমানে আমি পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করি। শুধু তাই নয়, বন বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষাও পড়াই আমি নিয়মিত। কিন্তু বন ছাড়াও এই কয়েক বছরে আমার বেশ পছন্দের হয়ে উঠেছে আরেকটি শহর হামবুর্গ। নতুন, কিঞ্চিৎ অদ্ভুত কতগুলো বন্ধু হয়েছে বলে নয়, এই শহরটাকে মনে ধরেছে এমনিই। অকারণ।

এমনই অকারণ এক আড্ডাবহুল বিকেলে আমার পরিচয় মারিয়ার সাথে। মারিয়া ওসেটিয়া বলে একটা না-রাষ্ট্র, না-দেশের মেয়ে। শুনেছি ওসেটিয়া এককালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল, এখন কোথায়, কেন, কীভাবে কার অংশ তা জানিনা। ওসেটিয়া নিজেও জানেনা বোধহয় সেটা নিশ্চিতভাবে। যাই হোক, মারিয়া হামবুর্গেই থাকে, পেশায় সাংবাদিক। তার বাড়িতেই জমেছিল আড্ডা। আর বাঙালির যেমন স্বভাব। স্বর্গে গেলেও রবিঠাকুর না আউড়ে ছাড়বে না, ঠিক সেভাবেই আমিও তাকে খান কতক বাংলা গান শোনালাম। ব্যস আর যাই কোথা! ওমনি জেদ ধরে বসল মার্চ মাসে হামবুর্গে নারী দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে আমায় নাকি গাইতেই হবে। আমিও ভাবলাম এমনিই বলছে বোধহয়। ভুলে গেলাম বেমালুম। কী সাংঘাতিক মেয়ে, আমি অরহুস ফেরার দুদিন পর ফোন করে বলে, "তাহলে ৪ তারিখ আসছ তো? ৫ তারিখ গাইতে হবে কিন্তু!" সে তারপর আমি সত্যি সত্যি গেলাম, গাইলাম। গোটা সন্ধ্যাটাই কাটল এক অসামান্য বিমুগ্ধতায়। একে একে শুনলাম স্পেন, মেক্সিকো, জার্মানি, ফ্রান্স, আফগানিস্তান, ইরান, পেরু, ওসেটিয়া, পাকিস্তানের শিল্পীদের গান-কবিতা। এতদিন শুধু লোকমুখে শুনতাম, সঙ্গীতের কোন ভাষা লাগেনা। সেদিন সেটাকে বাস্তবায়িত হতে দেখলাম। আমিও গাইলাম আমার মাতৃভাষায়। মৌসুমী ভৌমিকের গান থেকে রবীন্দ্রনাথ গাওয়া হয়ে গেলে ফৈজ আহমেদ ফৈজের গান ধরলাম। মুখে মুখে তর্জমা করার চেষ্টা করলাম যতটা পারি। আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে হলভর্তি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ দর্শকাসনে। আর মঞ্চে একের পর এক গান হচ্ছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের। কিন্তু কেউ এতটুকুও বিরক্ত নন। কারও উৎসাহে একচুলও ফাঁকি নেই। ফলস্বরূপ, মাথার ভেতর সমস্ত মানচিত্র, কাঁটাতার ঘেঁটে ঘ।

ইউরোপে এসে সব থেকে বড় যে শিক্ষালাভ করেছি তা হলো শিল্পকে, শিল্পীকে সম্মান করতে শেখা। এখানে মানুষ রাস্তায় গান গায় সম্মানের সাথে, মানুষ সে গান শোনেন মন দিয়ে, উৎসাহের সাথে। ভালো লাগলে হাততালি, টাকা। না লাগলেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এগিয়ে যাওয়া। সৌজন্যবোধ এখানে মারাত্মক প্রবল। মাঝেমাঝে অবশ্য অন্যরকমও হয়। এই যেমন একজন গায়ক একটা ডাস্টবিনের ভেতরে বসে গিটার বাজিয়ে গান করেন ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ শহরে। কিন্তু তা বলে কেউ যদি তাঁর অনুমতিবিহীন ছবি তোলেন ও পয়সা না দেন, গিটার নিয়ে তাড়া করতে সেই গায়কের সময় লাগে বড়জোর দুই থেকে তিন মিনিট। যেমন বিচিত্র শিল্প, ঠিক তেমনই তাল মিলিয়ে বিচিত্র শিল্পী!

সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর ইউরোপে আছি। কিন্তু এইটুকু সময়ে ইউরোপ দেখা বা বুঝে ফেলা অসম্ভব, আর ইউরোপের গান শোনা তো আরোই কঠিন বিষয়। সেদিন শেক্সপীয়রের নাটক দেখতে গিয়েছিলাম লন্ডনে। দেখে মনে হল আরো দেখি, আরো শুনি। দর্শকাসনের মাটিতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকি। পারিনি। তখন আমার জার্মানি ফেরার পালা। যা দেখেছি, শুনেছি, শিখেছি তাকে মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে দৈনন্দিন কাজে মন লাগানো। নতুন কোন শিক্ষায় মনোনিবেশ করা। কিন্তু সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে পড়ি আমি। কে জানে কোন শহরের কোন পথের ধারে আমার জন্যে হয়ত অপেক্ষা করে আছে কোন নতুন মারিয়া বা রেনে বা নিদেনপক্ষে একটা ডাস্টবিনের গিটার?

নূপুর মুখার্জি
দুর্গাপুর

ভোজন রসিক বাঙালি

বাঙালির ভোজন রসিকতার কথা বলতে গেলে মনে পড়ে যায় সেই সম্ভ্রান্ত বঙ্গ সন্তানের কথা যিনি কালী পূজা বন্ধ করার কারন হিসাবে তার কমজোরী দাঁত কে দায়ী করেন। প্রশ্নকর্তা তো হতবাক! দাঁতের সাথে পূজোর কি সম্পর্ক! ভদ্রলোক বলেন,'' বলির মাংস রসিয়ে না খেলে কালী পূজোর মজা কোথায়?'' এই না হলে বাঙালী। অন্নপ্রাশন থেকে শেষকৃত, প্রাতরাশ থেকে নৈশভোজ, পূজাপার্বণ, ঈদ- মহরম, আড্ডা থেকে চড়ুইভাতি- খাদ্য রসিক বাঙালির সব অনুষ্ঠানেই আহারের বাহার দ্রষ্ঠব্য। শুধু জীবিত বাঙালিরাই নন, বাংলার লোককথার ভুতেদের খাদ্য প্রীতি ও বিখ্যাত, বহু নিয়ম, বহু বাছবিচার।

বাংলার বাইরে বাঙালির প্রধান পরিচয় মৎস্য ভূখ হিসাবে হলে ও বাঙালির খাদ্যের তালিকা অন্যান্য প্রান্তের নিরামিশাষীদের থেকে বেশী বই কম নয়। মোচারঘন্ট, কচুর শাক, মান কচু বাটা, এচোরকোপ্তা, খোসা চচ্চড়ি, খোসা বাটা, ইত্যাদি, ইত্যাদি যে রীতিমত উপাদেয় তা বাঙালি ঘরে না জন্মালে বোঝানো মুশকিল। থাক, শাক সবজি মাছ মাংসের কথা। ফলাহারেও পিছিয়ে নেই বাঙালি। নবাবের সময় থেকে গোলাবখাস, বেগমখাস, চিনেছে তারা। এক ঘ্রানেই বাতলে দেন আমের গোত্র, ঠিকুজি। নবাব গেলেন, রইলো আম আর কিছু উত্তরাধিকার। তাদের একজন কুদ্দুস মিঞা, রিকশা চালাতেন, গুন গুন করে গজলের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে একদিন বাই চাপল, আম খাবেন। গোলাপজাম। অনেক দাম! কিন্তু কুদ্দুস মিঞাকে আটকায় কে! নবাবী মেজাজ। রিকশাটাই বেঁচে দিলেন এক কিলো আম কিনতে। আম খেলেন, তারপর গাছ তলায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন গজলের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে।

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে এই আমেরই বিচিত্র সম্ভারের সন্ধান পাই আমরা। গোলাপখাস,ক্ষীরসাপাতি, বেলসুবাসী, কাশির চিনি, বৌপালানে, বাঁদর ভ্যাবাচ্যাকা ইত্যাদি নানান আম যার নামকরণ অবশ্যই বাঙালি মস্তিস্ক প্রসূত।

আজকের দিনে বাঙালি বিয়ে বাড়ি মানে রাজকীয় ব্যাপার, ফুচকা পকোড়া, চাট, কোল্ড ড্রিঙ্কস, চা, কফি দিয়ে শুরু করে শেষ পদ কুলপি আইসক্রিমের সাথে যে কত অজস্র খাবারের আয়োজন থাকে বাঙালি মাত্রই জানে। তবে বিশ পঁচিশ বছর আগেও বিয়ে বাড়ির জৌলুস কোনো অংশে কম ছিল না। শুধু শহর নয় প্রত্যন্ত গ্রামেও বিয়ে মানে ছিল এক বিশাল যজ্ঞ। এক মাস আগে থেকে সাজ সাজ রব । মিষ্টির কারিগর এসে তৈরি করত- রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, দরবেশ, সরভাজা ইত্যাদি হালুইকর এনে রান্না করানো হত নানান পদ । বাড়ির আত্মীয় স্বজন কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশনে মেতে উঠতেন।

বাঙালি সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা, শিল্পী কমবেশী সকলেই ভোজন রসিক। অভিনেতা উত্তম কুমার, বিশ্বজিৎ দারুণ ভাবে উপভোগ করতেন সুপ্রিয়া দেবীর হাতের রান্না বিশেষ ভাবে মাছের নানা পদ। শিল্পী সানু লাহিড়ীর রান্নার প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে রান্নার বই- ই লিখে ফেললেন। হুমায়ন আহমেদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় এমন কিছু জিভে জল আনা রান্নার কথা পাই যা তাদের ভোজন রসিকতার প্রমান দেয় । আর ঠাকুর বাড়ীর রান্নাবান্নার কথা কারুরই অজানা নয়। খাদ্য রসিক ছিলেন তারা। খেয়ে ও খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন তারা।

প্রসঙ্গত, ঠাকুর রাম কৃষ্ণ যার মনের স্বাভাবিক গতি ছিল উর্দ্ধ দিকে, তার মুখেই আমরা শুনি- "তোমাদের এই ফোরণের গন্ধের বেনুন খেতে দক্ষিণেশ্বর থেকে এলাম" । শ্রী শ্রী সারদা মায়ের রান্না তাঁর শিষ্যদের কাছে ছিল অমৃত সমান। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী, কিন্তু মশলা বিহীন জোলো খাবার তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। বিদেশে থাকাকালীন কোনো একটি গৃহে আতিথ্য গ্রহণের সময় গৃহস্বামী তার পছন্দের খাবার জানতে চাইলে স্বামীজী বলেন -"আমি সন্ন্যাসী যা পাই তাই খাই" । পরে দেখা যেত সেই ঝালহীন খাবার কে সুস্বাদু করার জন্য স্বামীজী প্রচুর ঝাল সস মিশিয়ে নিতেন। বিদেশ থেকে ফিরে একদিন তিনি তার শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রান্না খেতে চান। শিষ্য রান্নায় বিশেষ পটু না হওয়ায় যোগীন মায়ের নির্দেশনায় তিনি রান্না করলেন। রঙ রসিকতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার শেষে স্বামীজী শিষ্যকে বললেন- "শোনো বাঙাল, যে ভালো রাঁধতে পারেনা সে ভালো সাধু হতে পারেনা- মন শুদ্ধ না হলে সুস্বাদু রান্না হয় না"। শিষ্য তো অবাক, ভাবছেন রান্নার মধ্যেও যে আধ্যাত্মিকতা আছে তা কে জানত?

বাঙালির রান্নাঘরে ঋতু বদলের সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাসের ও পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মের রান্না একরকম তো শীতের রান্না আরেক রকম । দোল, দুর্গোৎসব, নববর্ষ, পৌষপার্বন ইত্যাদি নানান উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে রান্না ঘরে আসে উৎসবের আমেজ। এরই মধ্যে শুরু হয় রান্নার উপর নানান প্রতিযোগিতা। রান্নাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কত হোটেল, রেস্তোরাঁ আর জন্ম হয়েছে বহু শেফের!

ভোজন রসিক বাঙালির আর এক প্রিয় খাবার হলো রসগোল্লা যার কদর সারা বিশ্বে। রসগোল্লার সাথে বাঙালির এক অদ্ভুত 'নস্টালজিয়া', তাই রসগোল্লাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হলো বাংলার প্রথম 'ফুডমুভি' 'রসগোল্লা'। এই রসগোল্লাকে নিয়ে শুরু হল বিতর্ক - এটি উড়িষ্যার না বাংলার। রসগোল্লা ছবির পরিচালক পাভেলকে এক বন্ধু মজা করে জিজ্ঞাসা করে,"যদি রসগোল্লা উড়িষ্যায় চলে যায়, কি করবি?" উত্তর- "বাঙালির হাত থেকে রেডিও গেছে, নোবেল ও চুরি গেছে, বাঙালি রসগোল্লা ছাড়বেনা"। যাই হোক, বাংলার বাইরে রসগোল্লাকে যতই রসগুল্লা বলুক না কেন এই গুল্লা ও গোল্লা দুটোই বাঙালির।

পোলাও, মাংস, কোপ্তা, কোর্মা, ইলিশ, চিংড়ি বাঙালির অত্যন্ত পছন্দের খাবার হলেও তার রান্নাঘরে জায়গা করে নিয়েছে 'চাইনিজ', 'থাই', 'মেক্সিকান,' 'আমেরিকান' খাবারের নানা পদ। বাঙালি আজ আর গতানুগতিকতার মধ্যে নেই। সে স্বাগত জানায় সব দেশের সুস্বাদু খাবার কে। বিজ্ঞান সম্মত সমাজদৃষ্টিতে বিবেকানন্দ জেনেছিলেন- শিল্প বিপ্লব আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে - প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য অনেক কাছাকাছি এসে যাবে। বিশ্ব একদিন হয়ে উঠবে ছোট নীড়ের মত। এখানে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বিত খাদ্যাভ্যাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাঙালি আজ সেই পথেই চলছে। নিজেদের সাবেকিয়ানা বজায় রেখে, অন্যের ভালটি গ্রহণ করেছে এখানেই তার অনন্যতা।

সৌম্য ভট্টাচার্য
আটলান্টা

খেলার উৎপত্তি

সদ্যসমাপ্ত পূজারী ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পর একটা ভাবনা মাথায় এলো। ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন দুটো খেলারই জন্ম ইংল্যান্ডে। তাহলে ধরে নেয়া যায় ব্রিটিশরা যেখানে যেখানে গেছে, এই খেলাগুলো সেখানে সেখানে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু কই, হিসেব তো মিলছেনা। সর্বমোট আট দশটি দেশ ক্রিকেট খেলে। সেই দেশগুলোতে যে ব্রিটিশদের ছোঁয়া লেগেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধরা যাক কেনিয়ার কথা। ব্রিটিশরা ষাটের দশকে বিদায় নিল। রেখে গেল ইংরেজি আর ক্রিকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ও অনুরূপ গল্প আছে। কথা হচ্ছে এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কোনো বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের নাম শুনিনিতো কখনো!

ব্যাডমিন্টনের ইতিহাস নেটে ঘেঁটেঘুঁটে দেখছি এটাও ব্রিটিশদেরই খেলা। মনে হলো ওদেশে তৈরী হলেও এর বিবর্তন ও আত্মীকরণে তদানীন্তন ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশদের গভীর হাত ছিল। তাহলে কি দাঁড়ালো? ব্যাডমিন্টনও একটি ব্রিটিশজাত খেলা। কথা হচ্ছে এই খেলাটি চীন, কোরিয়া , ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারতবর্ষ ও ডেনমার্কে ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্দোনেশিয়া মূলতঃ একটি ওলন্দাজ বসতি ছিল। মালয়েশিয়ার কথাটা খানিকটা ব্রিটিশদের সঙ্গে যুক্ত। যুক্ত ভারতীয়দের সঙ্গেও। তাহলেকি ব্যাডমিন্টন ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের হাত ধরে মালয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে যায়? চীনের বাইরে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যায় চীনেরা থাকেন মালয়েশিয়ায়। হতে পারে এঁদের হাত ধরে এ খেলা পৌঁছে যায় চীন দেশে। এবং সেখান থেকে পার্শবর্তী কোরিয়া ও জাপানে। যেহেতু খেলাটি প্রচন্ড দ্রুতগতির, বিশ্বের এদিককার মানুষেরা খেলাটিকে ভালবেসে ফেলে এবং বিশ্বসেরা হয়ে ওঠে। জানিনা এশিয়াতে ব্যাডমিন্টনের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ওপরে কোনো প্রতিষ্ঠিত গবেষণা হয়েছে কিনা!

Luxor in Vegas

Artist- Saikat Das

The blue light that is emitted from the top of the pyramid depicts the journey of the soul that travels to the heaven after death. Egyptians believe that the gates of the heaven open up and the blue light is what that takes the soul back to the place, where it originated from in the first place.

The Las Vegas Luxor Lamp is no ordinary lamp as it was created by the NASA and it is the same lamp that is even used on space shuttles that go up to the stars. The light has enough power to travel almost 3000-4000 feet up in the sky.

Asit N. Sengupta
Atlanta

The bygone days of Atlanta

It was 1958 when I arrived in Atlanta for the first time. And I felt quite lonely. You see, there was nobody else from India, let alone from Bengal, at least not to my knowledge. You may wonder if this city was any different from what it is today. Yes, it was vastly so. That is my story today. Incidentally, Trans-Atlantic commercial flights and the Federal Aviation Administration also started in 1958. I came from India on two ships, one of which was a smaller version of the Titanic and then Greyhound Bus. But in 1964, I took my first flight back to India on a Boing 707 plane. And when I flew back after 6 months, it was a truly overwhelming Boing 747.

In 1958 Atlanta was a city of barely half a million people, with a million scattered over the vast area that is metropolitan Atlanta today. The core city has in fact lost population since but the metropolitan area at about 5.8 million has four times as many people as it had when I first came. So, you see, what was largely a combination of forest and cultivated land, has turned into a vast multipolar urban area, with often mega-mansions and high or medium-rise cores. What made this possible was the building of the interstate highway system which cut through the entire area as well as encircled it as the Perimeter Road, coupled with the building of the world's busiest airport. Of course, the urbanized area has spilled over the Perimeter Road into very large chunks of land, calling for an unrealized partial second encircling freeway, as the expressways are called today. I remember well the early years of the 4-lane freeways, when one could truly drive fast with sparse traffic, while not necessitating a GPS or cruise-control (well, there was none in those days).

But in 1958, there was no interstate highway, none whatsoever. All main roads including Atlanta's backbone, Peachtree Street, were 4-lanes and all secondary streets were 2-lanes. There was one shopping mall in the entire city, Lenox Square, open to sky and with one big surface parking lot. Period. The area where they stand today, Phipps Plaza and multiple high-rise towers, used to be a forested land with one mansion deep inside. Also there used to be a small house facing Peachtree Street. Atlanta's first fine-arts gallery was housed there.

I became very much a part of the gallery and was somewhat adopted by the family that lived in the mansion and also owned the gallery. This pioneering gallery exhibited almost all-American masters and much more. I learned much about modern art and western music from this experience. Speaking of local traffic, I remember driving on Peachtree Street in a friend's car with failing brakes and also joyfully riding on the 2-lane Lenox Road like it was a roller-coaster. Imagine doing that today.

Atlanta was a sleepy town under the cover of trees and a rather pleasant sunny weather, unlike the lasting rainy weather of these days perhaps owing to global warming, and with undulating streets and mostly small homes, small businesses, strip malls where one could pull up to the store doors and where loud horns blared out latest popular songs, and a downtown with some buildings which were considered as high-rise in those days but dwarfed since by today's skyscrapers. As the new 4-lane then-called expressways cut through Atlanta's compact neighborhoods, there were no 60-mile entry and exit ramps. You had to come to a dead-stop on a single entry or exit lane and enter or exit very cautiously when it was safe to do so. Today, not only does the downtown connector look like a sea, but even most local main roads are 6-lanes with dedicated turning lanes. MARTA came in the late seventies and eighties and my humble self, played a major role in planning and designing it. Some of the old neighborhoods near-about the Governor's Mansion and Emory University still retain the character of old Atlanta. What constitute some of the most sought-after neighborhoods in the outlying areas of Greater Atlanta used to be forested and one could buy land there and right on the shores of the Chattahoochee at about $ 100 per acre! Why didn't I? That is another story.

Atlanta's airport used to be a small single-story building with a rather small surface parking lot in front (photo below). There was no security checking. As I arrived late one day, I literally ran through the airport and made the flight as the door to the plane was about to be closed. In a recent year a man went back the wrong way to pick up something he forgot and the entire airport was evacuated.

Atanta Airport in 1966
Photo credit: Atlanta Historical Society (AHS)

But what brought me to Atlanta in the first place? I was teaching on an "Exchange Visitor" visa at N.C. State College (now N. C. State University), in Raleigh, N.C., as a part of The Technical Co-operation Mission between U.S.A. and India, following India's freedom. During vacations I used to come to Atlanta and do consulting work for several firms. One such sojourn, during which I earned much praise conceptualizing a daring and innovative shopping mall, (model photo on the left) made it easy for me to return permanently to U.S.A, and yes Atlanta in 1970. Thanks to my special visa status, in-between I could stay in many other cities of U.S.A. and Canada.

Model for a shopping mall
in 1958, designed by the author.

Most of my years since 1958 have been spent in deep south including Atlanta. There used to be segregation in those days when some selected citizens were barred from entering many facilities and much more. However, people from India were mostly educators or doctors and highly respected and were accepted by all places including universities and hospitals with open arms. Today the vestiges of segregation are largely gone. Atlanta, unlike a few other places, was unique in forward-looking thinking and maintaining excellent race relations. It is no wonder that the great visionary, Reverend Martin Luther King, hailed from Atlanta. It is also no wonder that Atlanta's progressive outlook made this city over the many decades one of the important hubs in the country and even a host of the Olympic Games.

Things used to be personal and not digital, since computers had not yet taken over. Far from it. People, including VVIPs were highly accessible, particularly since I myself had some reputation as an accomplished professional. It was my good fortune that I had the privilege of meeting several notables, including President Jimmy Carter, who was the Governor of Georgia then. There used to be a festival called, "Steeplechase" on the outskirts of Atlanta. I was standing next to the fenced pathway for horses and the dignitaries, like Mr. Carter. Lo and behold. My unique brown face must have had attracted him. He came straight to me, shook my hands and spoke about his mother Mrs. Lilian Carter's visit to India. He enquired about me and invited me to visit him.That I did and to my most pleasant surprise, was received at the door by Mrs. Rosalyn Carter, who in turn invited me to visit again. I shall always regret that I did not.

In later years I also met Mrs. Coretta Scott King while making a presentation for the future of the famed Sweet Auburn Street, Atlanta's first black Mayor Maynard Jackson, whose name has been added to Atlanta's international airport, and worked closely with the presidents of Atlanta University and Spelman College, while preparing their master plans. I also worked closely with Atlanta Regional Commission, MARTA, Georgia Dept. of Transportation and major developers of Atlanta downtown and what is now Atlantic Station. All this because Indians were held in high esteem.

As I said things were personal and not digital. People were known by their names and not numbers, id-s, passwords, security questions and answers. When I called or visited, even my bank or a VIP, my name was enough identity. There were no ATMs, no self-checking at stores, no on-line purchases and no self-service at gas stations. Personal touch was the norm of the day. At gas stations young-men greeted you, checked the car under the hood and from outside, cleaned the wind-shields and more. Mailboxes were everywhere and so were pay-phones for local and long-distance calls. Hand-written letters mailed through the post-office were the norm. This is not to say that the advent of the digital system has no benefits but carried or obliged to the extreme to use it carries potential for a lot of harm. But I shall not discuss them now except one point. In the good ole' days children played games in the fields. Today they play "games" alone looking at a small screen, often through eye-glasses.

Now, back to where I started. Even though in 1958 I was the sole Indian, there were around a total of 35 Bengalis when I returned in 1970. We all formed a group called Probashi and met in individual homes in turn. There used to be food brought by the families (students did not have to), and songs which sometimes went well into early morning. There was no "Durga Puja". Only her daughters were worshipped in family homes. I suppose true to our fame, Probashi eventually split into Probashi and Pujari. Now there are several thousand Bengalis and many groups. There was no permanent home for the community then and alas, it is not there now, while a number of late-comer communities have built not only permanent homes but also temples. They moved from owning motels to major hotels and shopping malls.

Of interest, along with three other Bengali friends, we started the very first Indian restaurant in Atlanta, called Calcutta Restaurant on Peachtree Street itself. Personally, I also started a boutique named "Sengupta's" and my own architectural office, both at Peachtree Center in the downtown. They are all "gone with the wind". I am retired. But several members of the bygone Probashi, including me, are still there in Atlanta. Also stand several edifices which I designed including the Omni, the 30-story Peachtree Summit on the downtown connector and the ever-young Westlake MARTA Station: they will be there for many years and bridge the gap between 1958, today and tomorrow.

Dr. Ranita Sen
Irvine, California

~ Reminiscences ~

As the Bengali New Year approaches, once again my mind wanders away to the other side of the globe, to my hometown, Kolkata. The New Year celebration is popularly known as 'Poila Boishak'. It is the first day of the Bengali New Year, which usually falls in mid-April every year.

Growing up in a Bengali household, this was indeed an auspicious day of the year. It would be a day full of food, fun, laughter & music. I have memories of waking up to the sound of soothing music of Tagore. I would wear my new clothes & touch the feet of my parents and grandparents seeking their blessings. The rest of the day would be spent visiting neighbors and friends exchanging sweets and good wishes. Food would be an integral part of the day. My mother's kitchen would be bustling with the endless percussion of utensils along with the pressure cooker's rocking steam, and the sound of hot oil in a wok popping and bubbling in preparation of Bengali delicacies of fish, rice and sweets. The heady aroma of spices sometimes even pungent would tickle my olfactory senses which would invariably lead to a series of sneezes without fail. In fact, all the household kitchens in the neighborhood would exude the aroma of freshly prepared delicacies being carried through the air.

Today, as I sit almost ten thousand miles away from my hometown, the memories of the sounds and sights of this special day keep coming back. My mind is ushering the New Year with Tagore's musical invocation "Esho Hey Baisakh Esho Esho".

Although it has been almost three decades since I have physically moved away from the city that was home to me for the first 24 years of my life, on days like this I am transported body and soul inside the four walls of the house that I called home, walking the streets of my childhood days which takes me to the pond filled with water lilies floating atop, situated in the center of the neighborhood while I feel the cool wet breeze touch my face and sweep through my hair.

In spite of changing times, I hope Poila Boishak is still celebrated with the same fervor and passion. I feel blessed to have lived my childhood in the time that I did with the people that surrounded me. I miss that time but will carry the treasure trove of memories with me for as long as I live. With this I would like to wish all my Bengali friends "Shubho Noboborsho". May the coming year bring blessings of peace & love, happiness & joy in your lives.

By Swapan Mondal Atlanta

"**C**an I stay with you guys at the hotel tonight?" Rohan asked, after we had finished unloading his stuff at his freshman college dorm. "Of course!" I replied immediately, as I could delay my good-bye hugs by another 12 hours! What a great relief! I had been dreading this moment for many years! My countdown had started when he was barely 2-3 years old!

After our morning breakfast at the New York City hotel, my wife and I went to see Rohan off at the Metro station. We went inside with him, and time came quickly to say "good-bye". It was as hard on him as it was on us and so I didn't want to make it harder. After a tight hug, he quickly ran towards the platform and vanished into the NYC metro crowd. I desperately tried to get another glimpse of him, but I couldn't see him anymore!

My wife and I boarded a New Jersey bound PATH train after checking out from the hotel. On the next stop, a little boy of 4-5 years old, along with his young mother, bounded onto the train and, with much difficulty, managed to climb onto the seat next to us. The boy was carrying a dinosaur in his hand and making dinosaur sounds while playing with his toy – the similar toy and same sounds instantly reminded us of our Rohan, to whom we had said good-bye just half an hour back! Worried about the noise he was making on the train, the little boy's mother asked him to count from 1 to 10 instead. He counted 1, 2,3 and then 5 and missed many numbers before saying 10! His missing numbers, just like Rohan, was the last straw. Uncontrollable tears, threatening to explode for a while, flooded our eyes and steamed down our cheeks! The bursting of our emotional dam could not be stopped. I wondered what those passengers sitting across from us must have thought…what could possibly have made this middle-aged couple cry so profusely, all of a sudden!

The boy and his mother got down after a few stops. We also got down after another 2-3 stops. My wife was staring far away without looking at anything for most of the time on our way back home. And, my mind replayed all the events with Rohan in random order. My pillow-fight with him every night before he went to sleep, my choice to go for a career with almost zero travelling, and my decision to stop my MBA program after only a week, when my wife told me that Rohan waited for me near the front door every evening! (It took me another 8 years to restart my MBA program!) For many years I thought that I would attend the same college where Rohan would go, or at least stay near his school, wherever that would be, just so that I could be with him! What a crazy, unrealistic thought!

Finally, we came home to Atlanta. It was an eerie feeling when we entered the house. I asked my wife, "Didn't we bring little Rohan home from the hospital only a few years back?" My wife nodded her head unable to speak, and quickly vanished upstairs to comfort herself. I went to the deck of the house and stared out at the forest for a long while.

Arundhuti Dutta Roy
London

The Happiness Project

What is Happiness? A feeling? The meaning of a life well lived? A life purpose? Or merely an intangible we aspire to, devoting valuable time during our lifetime in its search?

There are few if any who do not wish to be happy. Asking someone what they want out of life will usually result in a statement along the lines of “To be happy and healthy”. Individual materialistic purchases are usually considered to be a tool however the main reason for the purchase is to create a ‘feeling of happiness’ albeit however fleeting!

It is so curious that we look outside ourselves to find this happiness when ultimately, we were all born with everything we need to feel happy inside…If only we knew how.

As human beings have evolved, life has become inherently more complicated. Travelling through historical events it is evident that the definition of happiness is relative and also changes at points. Happiness during times such as the world war, may have been for many, being with loved ones safely and having food to eat. Happiness in the modern day may be characterized by having an extravagant lifestyle, an ideal job and partner and a certain level of wealth which makes others envious.

The internet and wide spread use of social media has also introduced a constant comparative element which often shows the picture-perfect lives of many, which is unrealistic and impractical. For the majority, this can cause feelings of unhappiness and discontent, if that is not what YOUR life looks like.

Comparison

Research has shown that we tend to be happier when we feel we are on the same level of achievement or greater than our peers. This includes various areas; personal, professional, familial, social and hobbies. There is the need to both conform and we desire acceptance from standards society place on us. For e.g. promoting that if we are not performing to a certain set of criteria then we are not 'whole' or 'normal' and may be deemed 'a failure'.

Surely if the focus was turned inwards onto what we can control and the present moment savored (A key component of the technique of 'Mindfulness') then vast improvements could be made around our happiness levels?

Faith

Having a belief in a higher being or something which creates or directs us can be a huge help when determining levels of happiness. Often the feeling that we are not alone and that god walks by our side can help us get through life changing events even if we do not have a formal support network around us.

A confidence in the goodness of humanity and lending a hand to someone or those less fortunate can also help us to feel happier – The age-old adage; "When unhappy look at those beneath you rather than those above and you will appreciate what you have".

Society

It is disappointing that the original concept of 'love people and use things' has now become a society where a majority of people 'love things and use people'. We are accustomed to a 'box' life where we work in, live in, work on and speak on effectively a 'box'. We even eat foods which often come out of a box!

We repeatedly neglect our loved ones, taking them for granted choosing to spend time on a smart phone rather than actually communicating with those who matter the most.

Research has proven that the quality of our lives is proportional to the quality of our relationships so helping others outside of ourselves and creating a society where 'We' is more important than 'I' is essential.

Strength Study

Every human being has qualities which differentiate them from another. Focusing on our individual intrinsic strengths can also help us to feel happier. You will observe that what you concentrate on, grows. Hence focusing on one's strengths and further developing these will lead to a situation of natural competitive advantage. This is when you will be able to contribute far more to the world around you, your work and in your relationships!

Life Purpose

A large part of happiness is feeling that 'we are good enough' and that 'we are loved'. Stemming from this, leading a life you and those close to you are proud of is of upmost importance. However, not everyone is immediately clear on their life purpose and it can take years of analysis and experience to work out.

Once it is known and clear in your vision, living your life consciously, taking actions which directly fulfil your purpose, truly promotes the process of life-value alignment creating happiness!

Active Mind, Body and Soul

Meditation has widely been used to help calm and reprogram the mind and provide a feeling of wellbeing and happiness. In recent years, there has been much discussion over the use of the 'Mindfulness' technique and the development of apps like 'Headspace' advocating meditation as a way to relieve stress amidst a busy lifestyle.

Physical exercise undoubtedly has always had a place amongst the greats in determining happiness levels. Humans tend to look and feel better when they regularly exercise and have a diet and nutritional regimen that works for them. The key is to enjoy the forms of exercise you choose and allow yourself to eat whatever you want on occasion to ensure you don't feel constantly deprived!

Ensuring your spirit is nourished and striving for growth and contribution is important for a life of happiness. Do things which make you happy (as long as they don't harm anyone else!) and become a campaigner of self-care.

In Conclusion

Happiness is not a destination but rather a journey. Resilience, a positive mindset, compassion and empathy for others will take you far. Remember, difficult times come to all of us however in each situation we can either choose to 'react' or 'respond'.

In great uncertainty where you can see no end or life seems unfair, recall that the greats have had to overcome adversities and the most inspirational advocates are those who have lived to tell the tale!

Happy hunting and may you complete your own 'Happiness Project'!

Deepak Ganguly
Mumbai

Royal Bengal Tigers

I have started sketching tigers to create awareness among my friends- to tell them that we are not the only living being on our planet, earth. I sketched more than ninety individual tigers and more than two hundred and fifty sketches of tigers and other wild animals approximately. We depend on mother nature for our survival and it becomes our responsibility to protect her.

Royal Bengal Tigers, our National Animal, existed in good numbers during colonial and in early independence era. The tiger count was about 40000 in the beginning of twentieth century. But this number got to a dismal low due to indiscriminate poaching and game hunting by erstwhile Maharajas and Britishers. Hunting was considered a social status. Large scale extermination of wildlife by Mughals, monarchs and the British also contributed to it. Maharaja of Sarguja alone shot 1,116 tigers.

If we look at the status of big cats in India as per the latest All India Tiger Estimation, we now have approximately two thousand five hundred tigers left in the wild and approximately three hundred and fifty Asiatic Lions in a very small habitat. Recently the number reduced even more as several lions died because of an infection from local dogs living near the human settlement in Gir forest, Gujrat.

Project Tiger, a tiger conservation program, was launched on 1st April 1973 during Prime minister Mrs. Indira Gandhi's tenure to protect wild tigers from extinction. At the start of this project nine National Parks across India were declared as Tiger Reserves. Now this number has grown to fifty Tiger Reserves.

The demand of wildlife products in the illegal International market hit India hard. The 1990's official record says that around three thousand five hundred tigers were poached. The Sariska and Panna tiger reserves lost all their tigers due to this poaching. After the extinction of tigers from these two Tiger Reserves, tigers were translocated from other Tiger Reserves and introduced here. This has helped in augmenting the tiger population in both these areas.

Encroachment, deforestation, poaching and killing of wildlife is happening almost every day. Tigers being apex predator and the umbrella species of the ecosystem are now endangered.

The corridors-

Tigers being solitary needs more space to live and hence the need to protect the forest. They have large territories on which they walk and cover marking their territories. The forest or the wild heaven actually comprises of 89,164 km of tiger occupied forest on Indian land. Human settlement in forest corridors are now blocking the tiger movement in the forests. Therefore, exchange of tigers is crucial for a healthy tiger population. Considering the age of tigers and the first litter among fifty national parks only a few are considered as healthy population of tigers or even eligible to breed further.

If ancient animal corridors are blocked, there will be no movement or exchange of genes among these forests. The animals cannot not survive and the forests or the humans cannot exist too without the oxygen coming from forest. Think about the Delhi smog- this type of pollution is killing people every year.

New India Project development cuts down forest to build roads and railway tracks killing wild animals every day. Factories and industries pollute the atmosphere in the forests destroying wildlife too. Thousands of trees in the forest are cut down to make roads. If this situation continues then there will be no wildlife left in the forest nor will there be trees left. No tree means no oxygen and hence no humans. As the smartest animal on earth, we humans must act now or two thousand five hundred Royal Bengals and three hundred fifty Asiatic Lions will be history soon, just like Bali, Caspian and Javan Tigers are extinct forever.

Asiatic cheetahs are extinct from India.

Other endangered animals are rhinos, wild dogs, pangolins and great Indian bastards.

We must understand this problem and protect the vanishing forests now and protest against the deforestation and abuse on wildlife for our future generations.

-Sketches above are done by the author himself.

Asit Kumar Bhattacharya
Belur

Kriya Yoga

What is Kriya Yoga? What is yoga? Generally, Yoga signifies connection between body and the soul. Actually, it is the connection between Divine spark and the Divine Jyoti. For knowing above we will have to know our status-. yoga with whom? In fact, there is no two in this Universe. Only God /Ishwara is existing in this Universe as Ananta Jyoti Swaroopa. Ishwara has two parts-

a) Purusha--Ananta Jyoti

b) Prakriti--"OM" vibration

For this Om vibration, (creative force of God) the Jyoti is sparking. From this divine spark different objects are created- Planets, stars, human being, animals, trees etc. Om vibrations is of very high frequency. Divine sparks are also of very high frequency When the Divine spark is separate from the main body, its frequencies are gradually reduced and five elements -Earth, Water, Fire, Air and Akash - are created at different frequencies. We all are like bubbles in the sea which comes out from the sea and again goes back to the sea.

Human beings are the best creation of God and its behavior is little different. After death human beings do not go back to God. They again take birth as per their karmaphal or past karma. This coming and going goes on different process of liberation until they are liberated. One process of liberation is "Kriya Yoga". This KRIYA YOGA process is very fast as if you are going to Delhi by plane instead of a car or train. For knowing Kriya Yoga, we will have to know the owner of the body. Actually, this body do not represent "I". Our soul is the" I". To say correctly, the soul has created this body with 24 body parts to perform this worldly drama.

The 24 body parts are as follows: -

- 5-Bhutas or elements = Earth, water, Fire, Air, Space. (ক্ষিতি ,অব, তেজ, মরুত, ব্যম)
- 5-Pranas = Pran, Apan, Byan, Saman, Udan.
- 5-Karma Indriyas =Hand, Leg, Palm, Rectum, Sex.
- 5-Jnana Indriyas =Eye, Ear, Nose, Tongue, Skin.
- 4-Antar Indriyas =Mind, Chittva, Intelligence, Ahamkara.

All those 24 body parts cannot do anything unless they are powered with Prana Shakti (3.5 Volt current) supplied from the soul. (Soul is a condensed battery of Prana Shakti which can run our body for hundred years). There are many "Nadis" (very fine tubes) in our body which the Prana Shakti uses. Sira and Dhamoni carry blood. There are three main Nadis in the body called **Ida**, **Pingala** and **Sushumna**. There are three gunas- Sattva, Tama, Rajo (সত্ব, তম, রজ.) which controls human activities. When Prana Shakti flows through Sushumna Nadi, the body is controlled by Sattva guna. When flowing through Pingala Nadi we are controlled by Rajo guna and when flowing through Ida Nadi the body is controlled by Tama guna.

There are seven chakras (the prana shakti distribution center) in the body inside the Sushumna Nadi and inside the spine. (Please refer to the diagram at the end of this article):

1. **Sahasrara** chakra: Violet colored and having 1000 petals (20×50 layers) Mantra - Hesi (হেসী). Five Shivas stay at this Chakra. The malfunctioning of this Chakra may manifest as a disease of the pineal gland. brain, nervous system and full body control. It is located at the center of brain.
2. **Ajna** chakra: Indigo colored and with 2 petals. Mantra - OM (ওম). Lord Krishna stays at this Chakra. The location is at the junction of spine and skull (Medulla Oblongata). It controls the pituitary gland, nose, ear, eye, tongue and skin.
3. **Vishuddha** chakra: It is Blue colored and has 16 petals. Mantra- Hang (হং). Judhisthir/Bharat stays here. The location is at the back side of the throat. It controls and energizes the throat, voice- box, air tube, thyroid, parathyroid glands and the two hands.

4. **Anahata** chakra: Green colored with 12 Petals. Mantra– Jang (জং). Bishnu, Bhim and Hanuman stay here. The location is at the back of heart. It controls the heart, lungs, thymus glands. The malfunctioning would create Asthma, Tuberculosis etc.
5. **Monipur** chakra: yellow color-10 petals. Mantra- Rang (রং). Ma Durga, Brahma, Sabitri, Arjun and Lakshman stays here. The location is at the back side of Nadi. It controls the function of stomach, pancreas, appendix, small and large Intestines etc.
6. **Swadhisthana** chakra: Orange colored with 6 petals. Mantra- Bong (বং). Lakshmi and Narayan, Nakul and Sahadev stay here. The location is at the back side of the sex-organs. It controls the functioning of kidney and the sex organs.
7. **Mooladhar** chakra: Red colored with 4 petals. Mantra- long (লং). Sri Ganesh, Saraswati, Jagadhatri and Ma Kali stay here. The location is at the bottom of the Spine. It controls and energizes the following: - Muscular and skeletal system, the spine, the production and quality of blood, adrenal glands, growth rate of cells and general vitality. The malfunctioning of this Chakra may manifest as arthritis, rheumatism, spinal problem, blood ailments, allergy, broken bones, cancer, leukemia, brain ailments etc.

How our body functions: Prana shakti from Sahasrara chakra flows through Sushumna Nadi. Then it comes to the eyebrow point (called Kuthastha) and then goes to Ajna Chakra. It then comes down through the spine and Sushumna Nadi to the bottom of the spine at Mooladhar chakra. Here Sushumna Nadi ends and Prana shakti enters “KulaKundalini” (coiled energy center). This KulaKundalini is the “Matri shakti” of our body (Ma Durga). Shiva (Sahasrara) is giving power to Ma Durga and Ma is running / functioning of the body, that is supplying Prana Shakti to the body organs through two Nadis- Ida and Pingala, which are running along the spine in a cross-cut way with many branches to supply the prana shaktis to all the body organs. It finally goes out through our nostrils. When one Prana / breath goes out, it means our life is reduced by 4 seconds. We take 15 breath in a minute. Flow of Prana Shakti goes through Ida or Pingala one by one. That means when the Ida is active the Pingala becomes inactive. When flowing through Ida Nadi our

breath comes out of the body through left nostril, when flowing through Pingala Nadi breath comes out of the body through right nostril.

In the front side of our body the Kauravas are functioning: - 5 karmendriyas and 5 Jnanendriyas.10 indriyas are running in 10 directions. (5+5×10) =100.They are the100 sons of Kauravas. These Kauravas are powered with 6 Ripus - Kama (কাম), Krodha (ক্রোধ), Lobha (লোভ), Moha (মোহ) and Matsaryo (মাৎসার্য). Mainly our body activities are controlled by Kauravas and they are the wrong-doers.

The back side of our body is of Pandavas and Bhagaban Krishna is at Ajna Chakra.

Vishuddha Chakra---Judhisthir.

Anahata Chakra---Bhim.

Monipur Chakra---Arjun

Swadhisthana Chakra---Nakul

Mooladhar Chakra---Sahadev.

Pandavas are empowered with- Satya, Dharma, Shanti, Prem, Ahimsa.

Generally, we are engaged with Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsarya activities. As a result, we are enjoying pain and sorrow. In order to live a divine life filled with joy and happiness we will have to cultivate our Satya, Dharma, Shanti, Prem and Ahimsa qualities.

Ida and Pingala Nadis are supplying Prana shakti to the front side of the body. Ida = Tamo guna. Pingala = Rajo guna. Generally, Prana Shakti is flowing through the spine / Sushumna Nari and going to front side of the body through Ida and Pingala Nadis. In order to live a divine life, we will have to stay at the Sushumna Nadi. We will have to stay between the Ajna Chakra to Mooladhar Chakra. In this case Chakras will supply the life current to the organs to live with. The process of living in the Sushumna Nadi is called KRIYA YOGA. If you practice Kriya Yoga you become a divine man full of joy. and happiness.

How to do kriya Yoga: There are 10/12 kriyas around the process of breathing and other activities. Out of these, one main Kriya is given in Gita sloka no 4/29 (Jyanayoga):

"apane juhvati pranam prane panam tathapare /

pranapanagati ruddhva pranayamaparayana"-

It means that other devotees offer as sacrifice the incoming breath of Prana in the outgoing breath of Apana, and the outgoing breath of Apana in the incoming breath of Prana, thus arresting the cause of inhalation and exhalation by intense practice of Pranayama.

Pranayama started with 12 times initially then increased to 12×12 =144 times, then12×12×12= 1728 times at a stretch for attainment of semi Samadhi (12 hours) stage. Other Kriyas that we also need to practice are Ajapa, Han- Sau, Anta pranayama, Navi Kriya, our Kriya, Omkar Bahit, Gayatri Murchhana, Basudev Kriya. The aim of our life is Self- Realization. This can be attained by Kriya Yoga practice in our life. Yoga is your connection with your creator.

The main Gurus of Kriya Yoga practice are Mahabater Babaji Maharaj, Yogiraj Shyama Charan Lahiri Mahasaya. Other successors are Yogiraj Panchanan Bhattacharya, Bhupendra Nath Sanyal, Swami Yukteswar Giri, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Pranabananda Giri etc.

[I am in the stream of: Yogiraj Shyama Charan Lahiri Mahashay, Bhupendra Nath Sanyal Mahashay, Yoga Acharya Jwala Prasad Tiwari Ji, Yoga Acharya Subhas Chakraborty Mahashay (my gurudev). My article is based on the writings of Yogiraj Bhupendra Nath Sanyal, Yogiraj Pranabananda Giri, Yogananda Ji, Yogiraj Panchanan Bhattacharjee Mahashay, Yogacharya Subhas Chakraborty Mahashay and Baroda Charan Majumdar Mahasaya etc.]

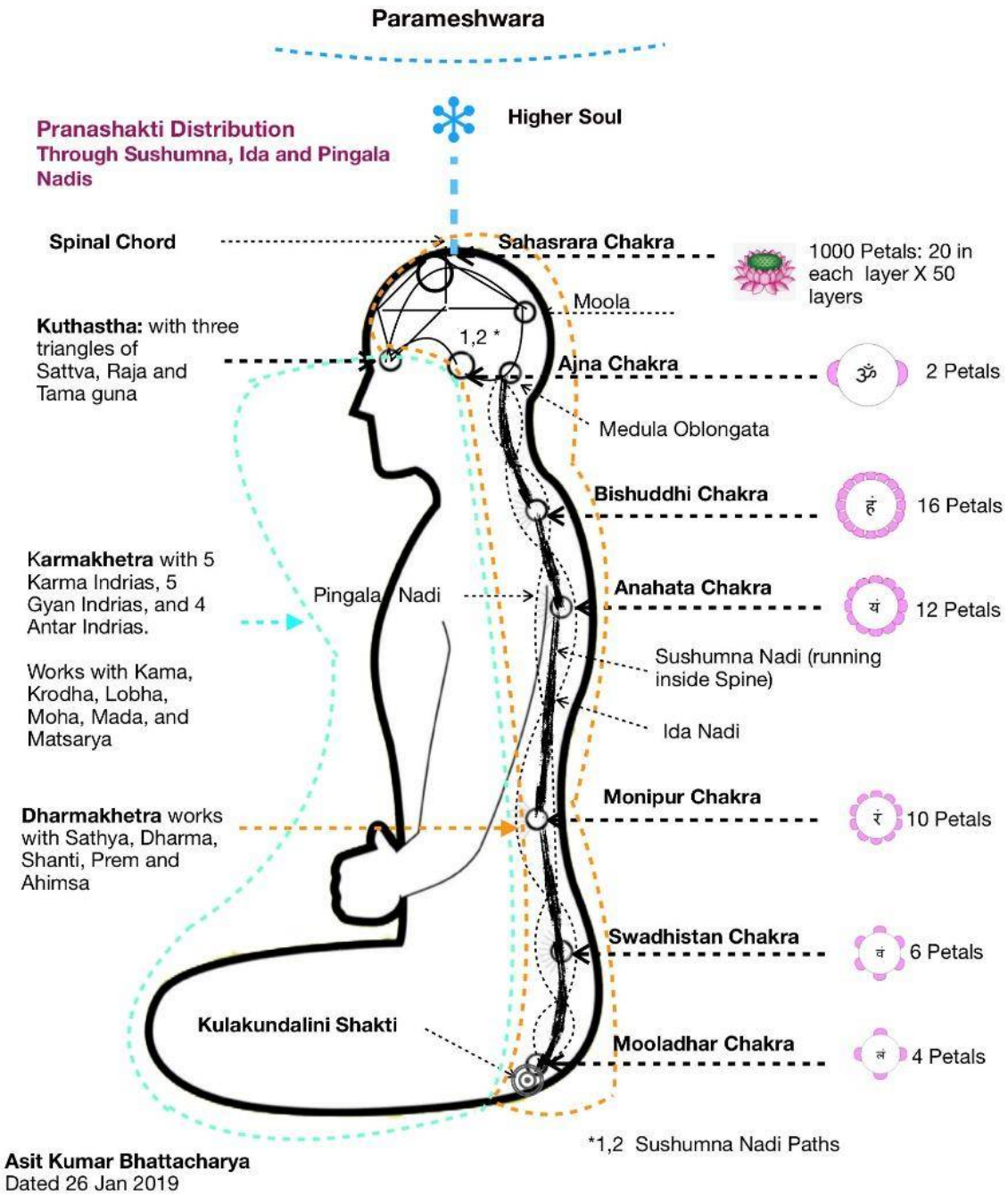
Parameshwara
Higher Soul
Pranashakti Distribution
Through Sushumna, Ida and Pingala Nadis
Spinal Chord
Sahasrara Chakra
1000 Petals: 20 in each layer X 50 layers
Moola
Kuthastha: with three triangles of Sattva, Raja and Tama guna
1,2 *
Ajna Chakra
2 Petals
Medula Oblongata
Bishuddhi Chakra
16 Petals
Karmakhetra with 5 Karma Indrias, 5 Gyan Indrias, and 4 Antar Indrias.
Works with Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, and Matsarya
Pingala Nadi
Anahata Chakra
12 Petals
Sushumna Nadi (running inside Spine)
Ida Nadi
Monipur Chakra
10 Petals
Dharmakhetra works with Sathya, Dharma, Shanti, Prem and Ahimsa
Swadhistan Chakra
6 Petals
Kulakundalini Shakti
Mooladhar Chakra
4 Petals
*1,2 Sushumna Nadi Paths
Asit Kumar Bhattacharya
Dated 26 Jan 2019

A Condimental Saga of Mustards

Ambarish Mitra

Part 1: A Tale of Two Condis

Once upon a time, not too long ago, there was a country called Condirica, where there were many warring kingdoms, but the two most dominant ones were Petchuk and Tusmard. The Petchuk army was red and round; the Tusmard army yellow and black spherical globules. These two kingdoms were perpetually in a state of deep animosity. Thankfully though, their hostility did not translate to an all-out war, perhaps because of the inherent balance of power that is given in a situation where the combatants are roughly equal in capability. Hence, any major peril was kept at bay in the country.

However, in a key diplomatic arrangement, the shrewd Petchuk army enlisted the support of a foreign country called Bret Gritan. Bret Gritan, being imperialistic by intention, had the most terribly efficient organization for conquest and occupation of remote lands – often starting by the deception of enterprise and trade. Emboldened by that unholy association, the Petchuk army took up a very belligerent posturing and a possibility of a perilous disaster became real. The Tusmard kingdom was alarmed as provocative skirmishing became a pattern rather than an exception.

With their civilization under such a constant barrage of onslaught by the enemy, the King of the Tusmard – Kashundi – felt compelled to let out a war cry:

Mustard lovers of the world, unite!
You alone know what is right!

Assembling behind that thunderous assertion, the mustard rose to the occasion and thwarted the unwelcome aggression of the ketchup. It rallied the troops, honked the horns, kicked the tires, readied the cannons and boldly defended its rightful territory- which is the dinner plate filled with chops and chips.

Part 2: The Condimental Divide

Unbelievable it may sound, but there exists a condicratic (not a spelling mistake) museum of the mustards, for the mustards, by the mustards. It is in Middleton, Wisconsin, USA. I had the good fortune of checking it out first-hand with my family in Jun 2018. At that time, the family was herding around Illinois and Wisconsin.

The 2 ruling ladies of my life, wife and daughter, crackled up like mustard seeds in hot mustard oil when I first told of my wish: “Let us check out the mustard museum.”

They (incredulous): “What? This is bizarre- a mustard museum!”
Me: “Yes. Absolutely- a mustard museum.”
“Heck”.

Evidently, they were amused, but not pleased.

The National Mustard Museum got us as soon as we said hello first time. As is the customary process in hyper-electronic world nowadays, we clicked a few photos in front of the museum and go in. It is a 2-story museum- the street level and basement level. The store and the mustard tasting station are located in the street level floor. As we climb down the stairs and go in the basement, we were amazed to see such a large collection of mustard derivatives; as if a parade of sorts was going on. Since fact is stranger than fiction, it should not be a surprise that one man’s passion led to that extraordinary collection of *the* condiment from all over the world.

A pack of playing cards has 4 suits. A lot of cards enthusiasts believe that the 4 suits represent 4 different seasons each with its own charm, its own color. Like mustard sauces, life flows through four different phases of life as depicted by the 4 suits in the pack. And how better can it match up with the museum, which also has four mottos: Learn, Taste, Shop, Laugh. It is all encompassing as far as finer taste of life is concerned.

Well, a pack of cards also has 2 jokers. No guessing here. ☺

Learn: We learnt the benefits of consumption of mustards over ketchup. That message is enshrined in the august walls of the museum – as evidenced in the accompanying picture. (And who did the research? Mustard Museum, of course, *without* any bias whatsoever) **Taste**: The museum has a tasting section. The plethora of samples of mustard sauces up for testing was mind-blowing. A drop in the tongue and it sticks with flavor. Your	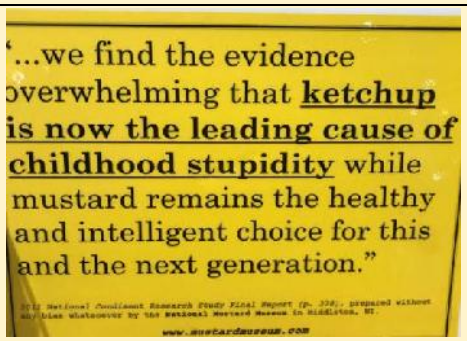 Aspect of Learn: Research study showing mustard winning over ketchup; that win was not handed over in a platter.

tongue will become a jumbled confusion of tastes. **Shop**: We bought a couple of jars for our home and a few more as gifts for friends. They were mighty impressed. **Laugh**: They say, humor is nature's best gift to mankind (next to mustards, of course). While you have heard and may have seen Mona Lisa, but have you ever heard about Mona Mustard? If not, then you do not know what you are missing out on life. For information about and knowledge of Mona Mustard, please rush to the museum. I am giving you this picture as a teaser.	 Aspect of Laugh: Mona Mustard graced the walls of famed Louvre once and nobody noticed.

Part 3: Condimentally Yours

October 27, 1986. Major League Baseball Series in New York, NY, USA. New York Mets versus Boston Red Sox. The Red Sox was well poised to win the match and tournament when the Mets bounced back from abyss and – as one Mr. Barry Levenson – a die-hard fan of Red Sox and whose predicament we shall soon see – exclaimed "Red Sox had snatched defeat from the jaws of victory". That night he really saw the proverbial mustard flowers with his eyes.

He had to get over the agony of supporting Red Sox. In an email exchange with me, he admitted that he was looking for "something that I hoped would be a more positive and smile-producing life." If there were no mustards, where, where, could be have taken recourse to bury his deep anguish! And how could he get rid of the ghost of defeat? He continued: "I found mustard to be the perfect adventure. It's something that we take for granted, has a long history, and adds so much to our lives." From that day on, he dedicated his life to the exalted status of mustards.

Barry Levenson was the head of Criminal Appeals Division at the Wisconsin Dept of Justice. In 1991, he gave up that job and founded the mustard museum. Metamorphosis never ceases to wonder: from caterpillar to butterfly; and from Criminal Justice to Mustard Museum founder. What a transformation! They say, life is all about self-discovery and in mustards, Barry was able to find his calling; he had truly arrived. From the depth of despair because of the loss of Red Sox, he emerged like a phoenix to become the curator of one of the most off-beat museums of the world.

We can have passion for a subject, but how do we build the courage to add muscle to that passion? Founding a 501(c)3 not-for-profit and then running it is not easy. A lot of people reading this will vouch for the truth. If you are anytime in Madison, Wisconsin or its neighborhood, do yourself a favor: roll the 4-tyres of your car towards the National Mustard Museum. Heck- why do you have to be in the

neighborhood! It is easy to get there from anywhere in the world. You see, the museum "is only a 45-minute drive from Wisconsin Dells, just 2-1/2 hours from Chicago, and a mere 6,978 kilometers from Dijon, France."

It is physically here: 7477 Hubbard Ave., Middleton, WI 53562 and e-logically here: https://mustardmuseum.com

You owe yourself a smile, if not anything else! The museum is free to visit; which, by implication, means not visiting will be costly. Please keep mustards rolling and kashundi flowing in your lives.

Barry signed off his email to me with:

Condimentally yours,

Barry Levenson, Curator and Founder
National Mustard Museum

Part 4: Condiment Trivia

a) Q: Which country is the world's largest producer of mustard seeds?
A: Canada [28% of world's produce]

b) Q: Which country is the world's second largest producer of mustard seeds?
A: Nepal. [26% of world's produce]

Combining these 2 countries, we have 54% of the world's total produce. Now, add Burma [13%] to the mix, and these 3 countries together produce 77% of the world's mustard.

c) Q: Which country is the world's largest exporter of mustard?
A: Canada.

Although India does not feature in the top 10 countries of the world in producing mustards, it is the 6th largest exporter of mustards in the world.

[If you did not get the 3 questions right, you must be a ketchup lover]

-Gopal looking for flute

Artist- Piya Sen Gupta

Sreerupa Sen Gupta Banerjee
Atlanta

Easy Peasy Old-fashioned Coffee Cake:

Ingredients -

1 package Butter Cake Mix (18.25 oz) – you can get it from any super-market

1 cup sour cream

1/3 cup vegetable oil

2 teaspoons ground cinnamon

2 tablespoons brown sugar(packed)

1 cup chopped pecans or walnuts

1/4 cup white sugar

1/4 cup confectioner's sugar

2 tablespoon milk(regular)

4 large eggs

Method:

1) Combine 2 tablespoon cake mix, cinnamon powder, brown sugar, and pecans; set aside
2) In a large bowl, blend rest of the cake mix, sour cream, oil, water, eggs, sugar; beat on high speed for 2 minutes till all are blended well
3) Pour 2/3 of the batter into a greased and floured bundt pan (or any other cake pan of your choice). Sprinkle the cinnamon sugar mixture (mentioned under point 1) in the center of this batter and then pour the rest of the batter gently and evenly over this.
4) Pre-heat the oven at 375 degrees F and then bake for 45-55 minutes; cool in the pan for 25 minutes and remove. Cool completely.

To make the glaze:

Blend the confectioner's sugar and milk together till there are no lumps; drizzle this on the cooled cake.

Enjoy!

Yummy Caramel Coffee:

Ingredients –

1 cup whole milk

1/4 cup store bought caramel sauce

1 teaspoon brown sugar

2 cups (16 oz) hot coffee

Whipped cream – store bought or make it at home

Method:

In a small saucepan, stir together milk, caramel sauce and brown sugar. Heat over medium heat for 4-5 minutes or until foamy and steaming, whisking frequently.

Divide coffee between 2 large mugs and pour the mixture equally in them. Top each mug with whipped cream and drizzle of caramel sauce.

-Mountains

Artist- Sukanya Mukherjee

Kids' Kingdom!

"A child who reads will be an adult who thinks."

-Unknown

Story

Art

Poem

Artist- Ahana Chaudhuri, Kolkata

Age-13

Trinav Banerjee
Seattle Washington

Age 10

Lining up

We line up like a train,
By the window pane,
First people first, last people last,
We walk just as fast,
We are a bullet train,
Sometimes we get stuck,
As if we are at a red light,
Our lines are sloppy with blobs everywhere,
We are buzzing like bees,
But sometimes if we focus then our lines will be as straight and quiet as a twig,
Lining up is fun.

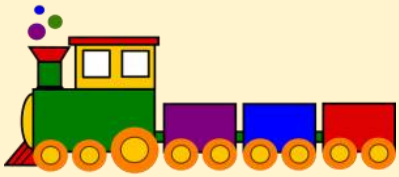

Artist- Tarnija Sarkar, Atlanta

Age-10

Srinika Dutta
Atlanta
Age-11

White Winter

The sky is dark
The ground is white
Trees are as bare as stones
No leaves at all
Just the white, white winter
The sky is dark
The ground is white
I made a snowball with my hands
And threw it at my brother
He threw one back at me
The sky is dark
The ground is white
The white, white winter melt into springs
My favorite season is over
Time for spring

Artist- Akansha Sur, Atlanta

Age-4

Avinash Paul
Pennsylvania
Age-14

Who Am I?

I am the vibrant, soothing color of sapphire
I am calm and cool like the sparkling blue ocean.
I am the sharp shape of a rhombus
Because I am intelligent and imaginative.
I am the plastic texture of Lego's
Because I love building and making what I build immaculate.
I am the diverse flavor of an ice cream sundae
Because I am creative and sweet.
I am the squeaky squeak of a mouse
Because I am not whiney and my voice is naturally high pitched.
I am friendly and trustworthy.
I am glad to be me.

Artist- Mihika Chatterjee Atlanta

Age-5

Sanayah (Raina) Basu
Atlanta
Age -13

A Better Place

2001 - 28,000
2002 - 30,000
2003 - 31,000
2018 - 34,000
You must be wondering what these numbers are for,
These are the number of people that are not here anymore.
For all the people who have lost their lives to gun violence,
We owe it to them, we need to break the silence.
Protest we must,
For the lives that hit the dust.
People buy the bullets for pennies we could care less,
And these bullets, snatch away the lives that are priceless
I ask you and I ask you all,
To wake up and answer to the call.
Help your friends with emotional plight,
Become their mentor, fill their darkness with light.
Reach out to the victims of domestic violence,
And not let your friends suffer in ignorance.
Make the Gun dealers accountable,
It is high time they become more responsible.
Let 2019 be the year when things turn around,
And the number of Gun violence deaths starts going down.
Let's change the gun laws that are a disgrace,
And make this world a better place.

Artist- Anisha Bhattacharya, Atlanta

Age-10

Ishani Datta, Atlanta
Age- 16

Importance of Culture

Culture augments our quality of life and enhances the overall prosperity of individuals and the community. Culture is the crux of a zestful society which can be expressed through language, food, entertainment, morals, stories, celebrations, and so much more. Aside from the economic and social benefits, culture allows for creative expression which essentially defines who we are. It provides a sense of togetherness with opportunities to converge. Immersing oneself within one´s culture benefits people in numerous ways, some of which are very personal.

Culture is the glue that holds communities together. My culture has become a solid part of my identity. My culture is present in the amazing food that my mother makes every day, the theatre performances my father takes part in, the songs my sister and I sing along to, the clothing we wear, and the places we visit. The differences in culture teach us to be tolerant and open minded. Without different cultures society would not be able to progress at the rate that it does. Sometimes, it goes unnoticed but culture is also present in the ethical decisions we make. It is important to be aware and tolerant of the diversity around us. Our environment increasingly consists of various cultural, racial, and ethnic groups and it is imperative that we respect each other to facilitate cooperation.

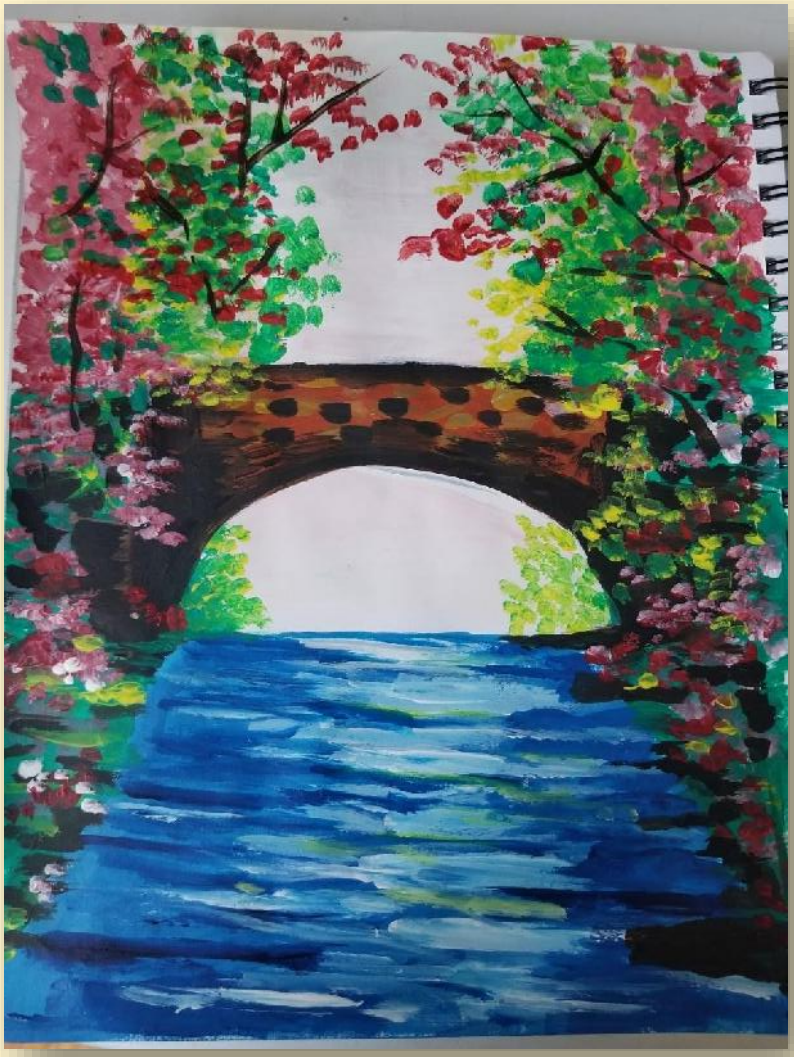

Artist- Rayaan Maiti, Atlanta

Age-6

Arushi Majumdar, Atlanta
Age-15

Dadu

As a young child, I loved vintage entertainment. The anachronistic art style of old cartoon characters brings about a warm wave of nostalgia upon me, the static sound of the musical scores played during each animation euphonious. Mickey mouse's devotion to Minnie set a precedent for my future relationships and Popeye's erratic scatting and spinach-induced hypertrophy mesmerizes me to this day. But, most of all, I was in love with Charlie Chaplin. He was a true artist, a revolutionary, a maker of works that will transcend time. His silent films were all I watched, films like The Pawnshop and The Dentist. In my heart these moving pictures equated to someone I loved exponentially more, my grandfather (Dadu). Dadu would sit me on his lap and we would stare at the monochrome screen watching each exaggerated expression and ungainly gait while struggling to breathe, our guts clenched to ease the pain of our hearty laughter.

Soon enough I was a teenager and, lost in my own world of puberty and social politics, I was too self-obsessed to notice that Dadu's time was fleeting. Then, freshman year hit and my world came crashing down; Dadu had passed away. Since then I've beat myself up countless times for not showing him how much love I had for him, for taking advantage of the time we could have spent together. I haven't completely forgiven myself, but one thing reigns true, I will always have Charlie Chaplin to remember him by.

Red Eyed Tree Frog (Pastel)

Artist- Avinash Paul Pennsylvania

Age-14

Anandita Mitra, Atlanta
Age 11

Horseback Riding Experience

Hi, today I will tell you about my first horseback riding experiencer! It was awesome, and if you really get interested in doing this while reading my story, then you should go try it out too. Read on, to find out more!!!!

One sunny day, my family and I were going to Lake Lanier Islands to ride horses. When we reached the stable, I saw all kinds of horses, different color ones, small ones, big ones, and many other beautiful looking ones. Once I got actually went inside the stable, my eyes immediately fell on one particular horse, its name was “Dixie”. A few minutes later, the staff members asked how many people were going to ride and we said 2 (my dad didn’t want to ride). A lady then gave us our helmets. Finally, it was the moment that I was most looking forward to… getting assigned our horses! Once I heard that my mom got Dixie, I felt a little spark of jealousy inside me. But I didn’t let that affect this amazing time. I got assigned a horse named, “Mia”. She was a very sweet and loving. Right after I started petting her, she kept on licking me! It was an amazing feeling to get licks from a horse because it was my first time. I only had dogs and cats lick me before. Next, came the small training.

A nice lady took my mom and me to a small training area. As usual, my mom started taking about a zillion pictures of me (The lady taught me how to get the horse moving and how to get it to turn right and left too. She also taught me how to hold the rope of the horse correctly. I even learned how to stop the horse from moving. A man was teaching my mom. While we waited for our trail guide to come, Mia would not stand still! She kept on moving her feet and when I petted her to make her quiet down, she brayed at me! Finally, my mom came with Dixie, but our trail guide had still not come. There was another group of men in front of us and when a staff member opened the gate to let them out, Mia also followed them to the gate. I was scared and didn't know what to do. Luckily, someone was standing at the gate and could stop Mia before she went onto the trail. But something happened after that too. Mia climbed onto a very small hill that had a downhill part on the bottom of it. I thought that both of us were going to fall onto the bottom, but when our guide came, thankfully Mia did not fall. Then, came the part where I was scared the most… the hard trail.

When we started riding on the trail with our tour guide, Dixie would not cooperate. My mom told her over and over again to start moving, but she just wouldn't continue on the trail. Finally, one of the other staff members told us to start the trail on a different path. When we rode on that different path, Dixie would finally move and we could continue along our trail. During the ride my mom and I saw deer and they were so close to us that we could literally touch them. It was like we were living outside and could walk next to real deer. Dixie and my mom were in the back, and Dixie would not move again. To solve that problem, our trail guide told my mom and I to switch places. My mom said that she would be worried about me and refused to switch places, but I convinced her that I would be fine and she went in the middle of the tour guide and me. 10 minutes into the trail, all three of us spotted a broken branch and it was in our way. So, we had to ride through the trees, following the hard

way. After we had gotten to the part where the trail loops around and we started heading back, there was a huge lake and we had to go to the immediate edge…

When we were turning to go back to the stables, we had to ride on a cliff to do that. And believe me, that was really scary. I tried to be calm and was telling Mia to go slow and carefully, when I realized that we were already far away from the scary edge. “That wasn’t so bad after all”, I thought to myself. Now, Mia was behind Dixie and was following move she made. Dixie went much to the right, Mia went much to the right. Dixie went off the trail, Mia went off the trail. Since Mia was following Dixie’s every step, I got hurt too. Dixie walked right into a tree branch and my mom ducked to avoid getting hit by it. When Mia walked into the branch, I was too slow and my hand got scratched by the prickly thorns. Everyone rode back to the stables and when my mom and I walked inside, IT WAS AMAZING! Horses all around us, neighing and braying. It was very loud, but I was having such and awesome time, I didn’t even mind. While we were getting out of the stables, there were two mules. Their names were, Coco and Henry. There were actually running away from the stables. I was worried so I went and got a staff member. Surprisingly, a trail guide said it was normal for them to leave and it was no big deal. They just got them back by offering them carrots and I got to feed Coco a carrot. When a lady put the silly mules back into their little place, I went to pet them, and guess what? They bit my hand, thinking that it was food! Then, we had to leave and go back home.

So, that is my horseback riding experience at Lake Lanier Islands. It was really fun, and if you want to try it out, go and ride a horse. If you do go, I hope you will tell me how it went and what horse you got.

THE END!!!!

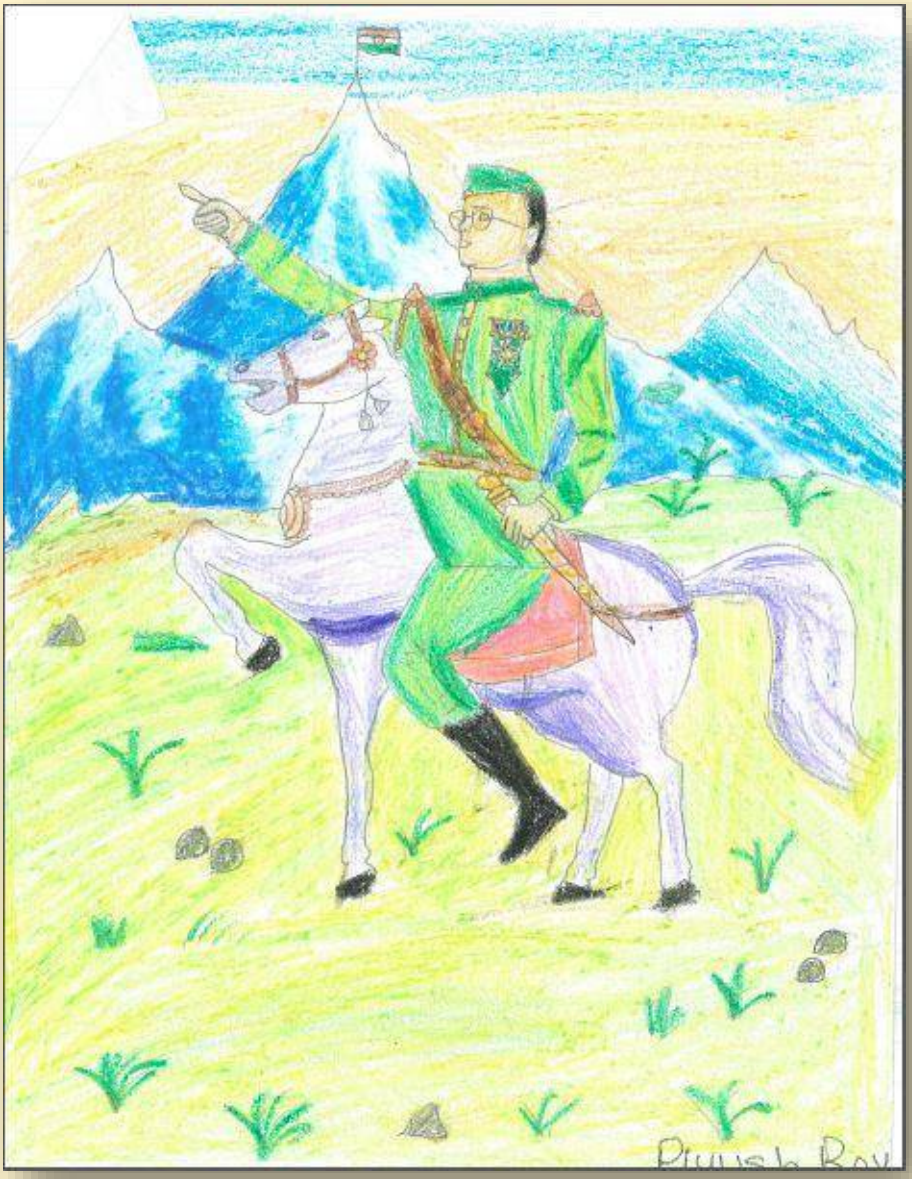

Subhas Chandra Bose

Artist- Piyush Roy, Atlanta

Age-12

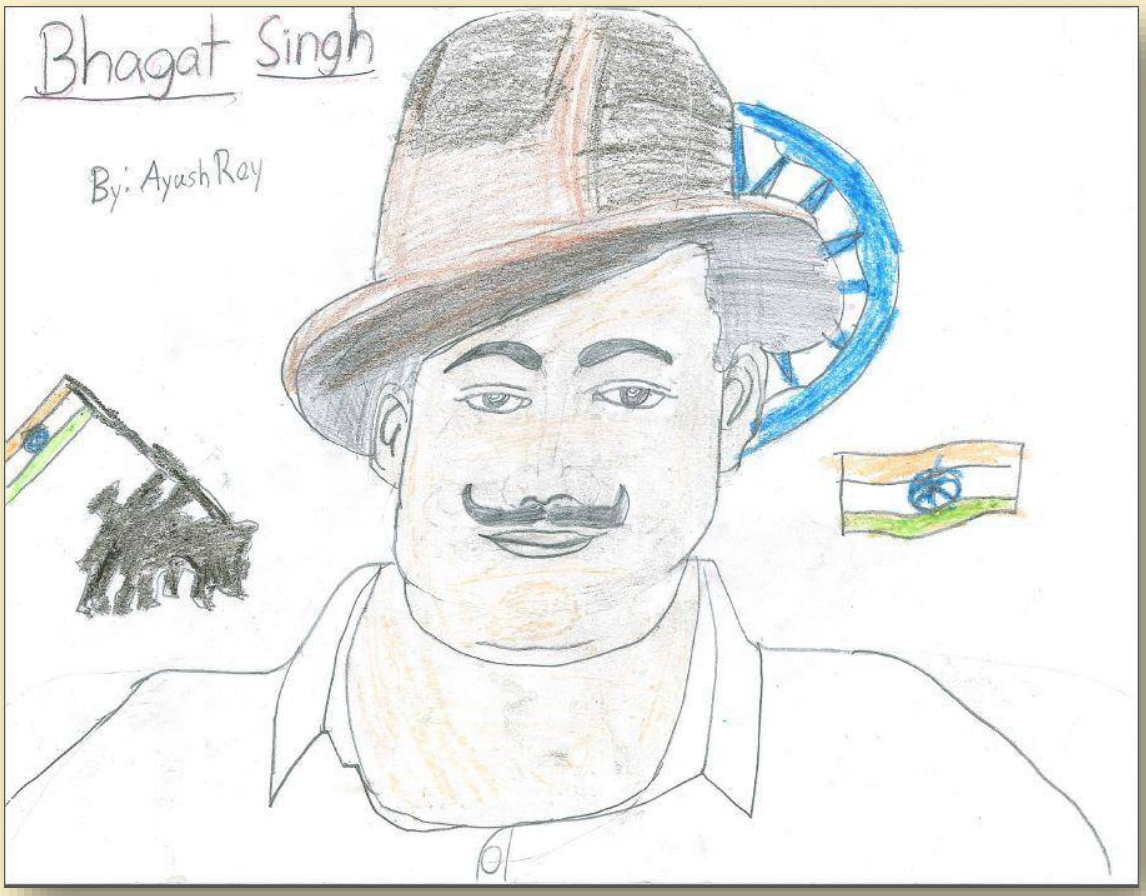

Bhaghat Singh

Artist- Ayush Roy, Atlanta

Age-8

Artist- Tvisha Saha, Atlanta.

Age- 7 years

Artist- Siddhant Banerjee, Atlanta

Age-5

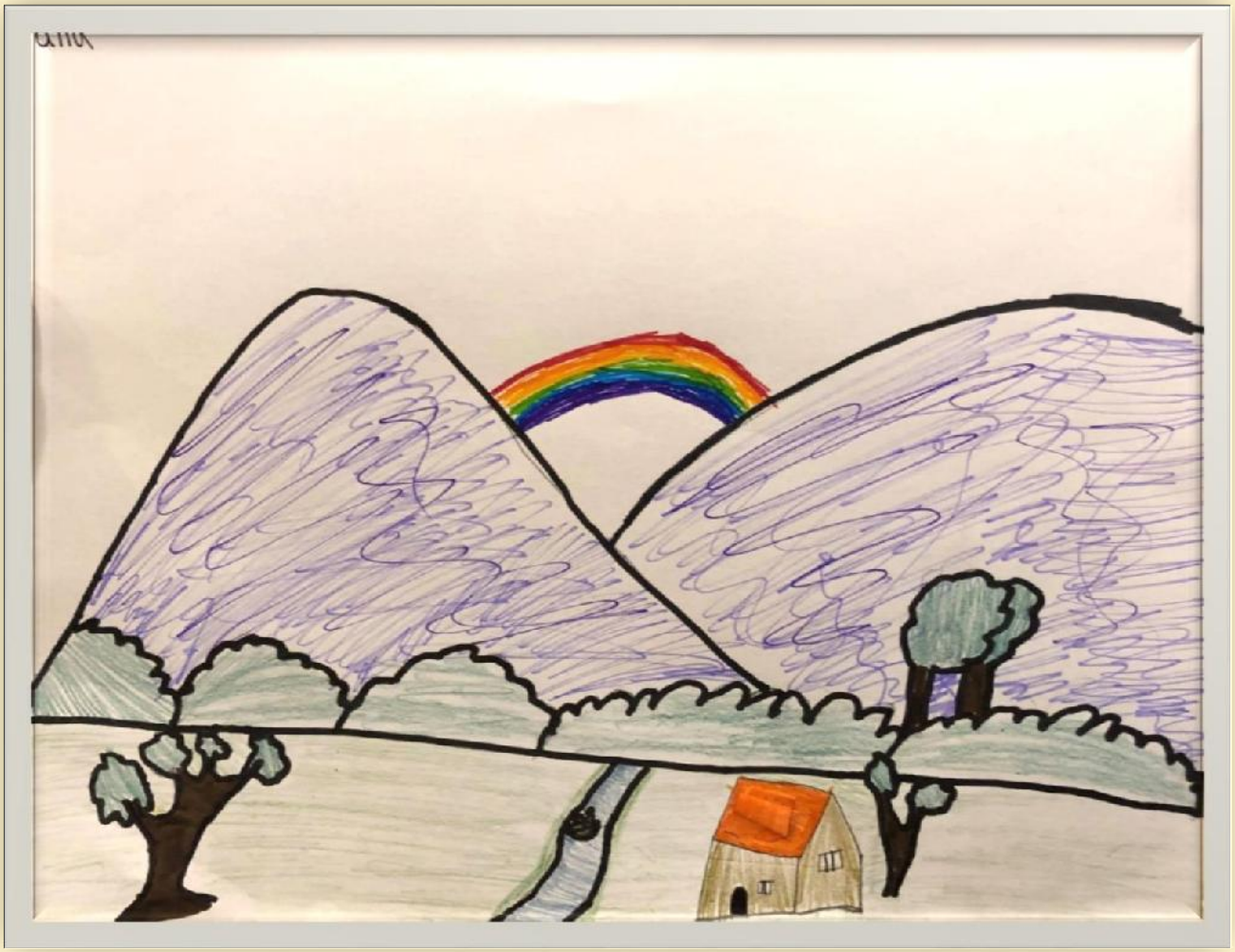

Artist- Shayna Banerjee, Atlanta

Age-9

Artist-Snigdha Mukherjee, Atlanta

Age-6

Ma Saraswati

Artist- Siddhant Mukherjee, Atlanta

Age-10

Artist: Aarshia Datta, Atlanta

Age-10

Artist- Sahana Mondal, Atlanta

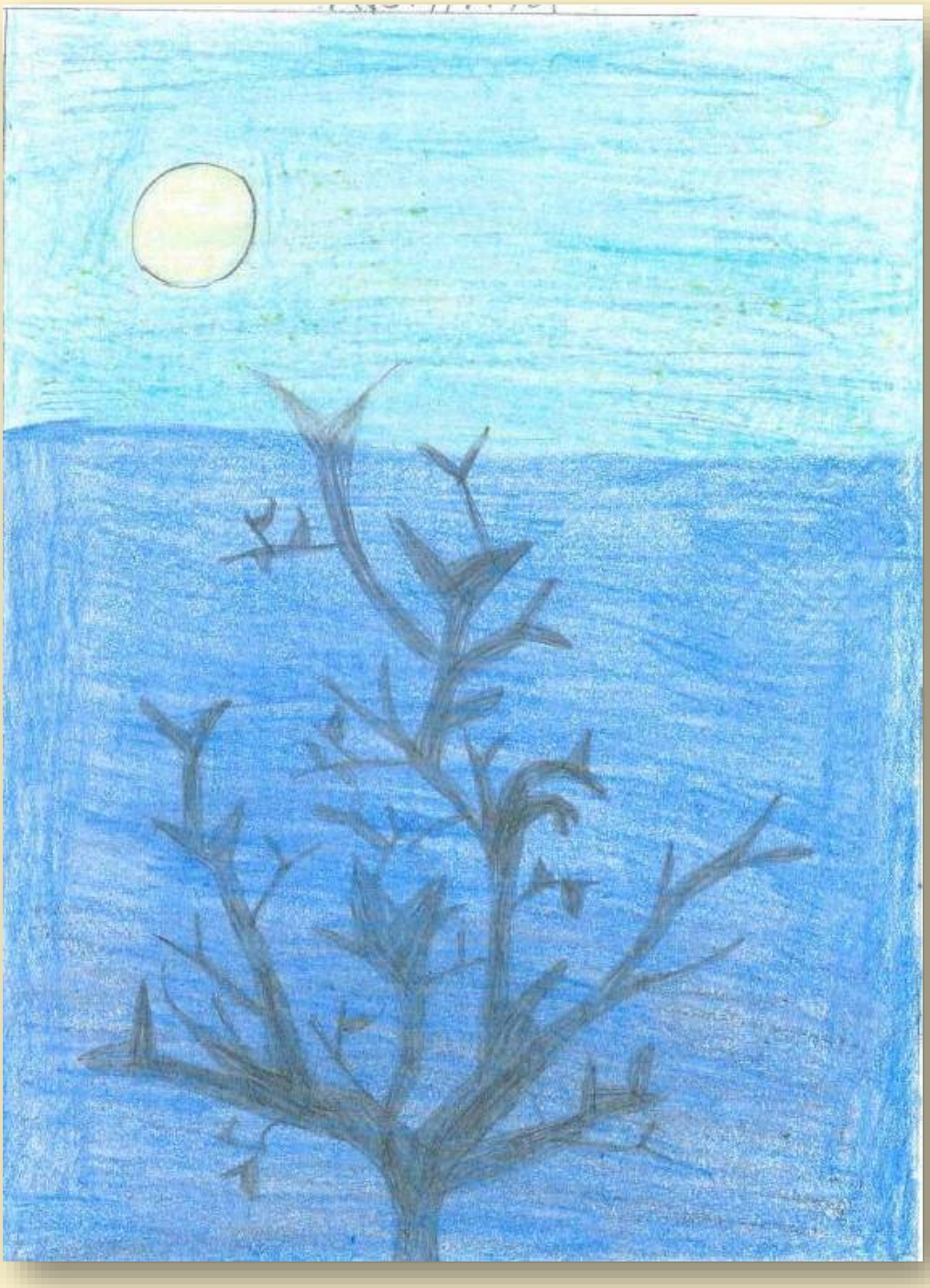

Artist- Rishima Saha, Atlanta

Age – 7 years

শিক্ষার শুরু

২০১৯ সরস্বতী পূজোতে হাতে খড়ি অনুষ্ঠান, পূজারীতে

পূজারীর সরস্বতী পূজোয় নানা রঙের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সুরের ধারা

শিশুদের গানের অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠান পরিচালনায় - বৈশাখী মুখার্জী, মুক্তা সাহা

Rhythmz
Kids' dance programme
Directors-
Aradhana Mazumdar Bhattacharya, Payel Dutta

নব আনন্দে জাগো

শিশুদের নৃত্যানুষ্ঠান
অনুষ্ঠান পরিচালনায় – রূপা ব্যানার্জী, সুকন্যা মুখার্জী

Fungama
Quiz Show
Directors-
Sushmit Mukherjee, Mohana Mitra Das

Magedy

Magic Show by Anik Dey

Pujari presents Madol band in Baisakhi once again!

পূজারীর বৈশাখীতে নানা রঙের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নারী দশরূপা থেকে শতরূপা

পরিচালনায়:
নমিতা ভার্মা মুখার্জী, তনয়া চট্টোপাধ্যায়

পথ চাওয়াতেই আনন্দ

পরিচালনায়:
দেবাদৃতা গোস্বামী, শুভ্রা ব্যানার্জী সরকার

শুরুর সেদিন

পরিচালনায়:
রিচা সরকার

অংশগ্রহণকারী:
পি কে দাশ, শ্যামলী দাশ, বিজন দাশ, কল্পনা দাশ, বুলা গুপ্ত, প্রণব লাহিড়ী, সুহাস সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

হৃদয় বসন্তকুঞ্জে - শ্রুতিনাটক

পরিচালনায়:
স্বাতী দে

বাংলা ব্যান্ড –মাদল

পরিচালনায়
সুরজিৎ বন্দোপাধ্যায়

Thank you, readers!

The Pujari Publication Team has worked diligently to create the free online version of "Anjali". We hope you enjoyed reading the magazine as greatly as we enjoyed publishing it. We have received many submissions from locals and people worldwide. The Publication Team is extremely honored to receive a poem from the renowned author Amit Chaudhuri for 2019's Baisakhi edition. Enjoy Bangla Nabobarsho to the fullest!

Warm wishes,

The Pujari Publication Team, 2019.